KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫ সরকার মার্কেট লেন, কল-৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 13/1 13/2 13/3 14/1	Year of Publication : Oct - Dec 1989 Jan - March 1989 July 1990 Feb 1991
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

৪৮

বিশেষ সংখ্যা

বিভাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ

সারা দেশে আইন অনুসারে পরিবারের প্রতিটি
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক

* জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র কেন প্রয়োজন :

বিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরি, ভোটাধিকার অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, পাসপোর্ট সংগ্রহ, বীমা পলিসি পাওয়া, পেনসনের নিষ্পত্তি, সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীর নিরসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

* শিশুকল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল :

কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও মাতৃমঙ্গল সংক্রান্ত পরিষেবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্ভুল জনসংখ্যা, তার গতি-প্রকৃতি ও বিভিন্ন নীতির যথাযথ মূল্যায়নের জন্য জন্ম-মৃত্যুর পঞ্জীকরণ একান্ত আবশ্যক।

* কাকে সংবাদ পৌঁছে দেবেন :

শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া বা ক্যান্টনমেন্টে ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর-এর কাছে জন্ম বা মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে।

* কত দিনের মধ্যে :

শহরাঞ্চলে জন্মের সাতদিন ও মৃত্যুর তিনদিন এবং গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দ-দিন ও মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে সংবাদ পৌঁছানো আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি পেশ করলে পঞ্জীকরণের প্রমাণপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ১০১৭/৯০

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বসন্ত সংখ্যা ১৩৯৭

চতুর্দশ বর্ষ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

প্রবন্ধ

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ও শিক্ষকের কর্তব্য ১ অশীন দাশগুপ্ত

রথীন্দ্রনাথের জীবন ১৫ পিনাকী ভাদুড়ী

বিচ্ছিন্নতা ও মনোবিকলন : ফ্রয়েড হাবারমাস ৩৭ পথিক বসু

কবিতাগুচ্ছ

সুবিনয় ধরের কবিতা ৬ হেমোপম দস্তিদার

কবিরুল ইসলামের কবিতা ২৯ মল্লিনাথ গুপ্ত

ক্রোড়পত্র

এরেন্দিরা ৫৩ গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার
দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ

শঙ্কর ঘোষ। অনুপ রায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত
ও টেক্‌নোপ্রিন্ট, 7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

মনে হয় সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা ছাড়া কেন্দ্রীয় নেতাদের আর কোনো করণীয় কর্ম নেই। ছিল পাঞ্জাব, এল কাশ্মীর, এভাবে যে কত নিত্য-নতুন ধর্ম-জাতিভিত্তিক সমস্যা ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে মাথা তুলবে, তুলছে, —দেখলে শুধু ভয় নয়, আতঙ্কে হিম হয়ে যেতে হয়। যেন আসমুদ্রহিমাচল এই বিশাল দেশের সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে, শুধু সাম্প্রদায়িকতাই যা একটু বিব্রত করছে জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রাদের।

একটু পেছনে তাকানো যাক। যদি বলি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীই একসময় সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়েছিলেন, তবে স্মৃতিদুর্বল অনেক ভারতীয়ই হৈ-হৈ করে উঠবেন। গান্ধীজী আমাদের শ্রদ্ধেয়, শেষ জীবনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তাঁর মহান ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রেখেও আমরা বলতে বাধ্য ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একই গুরুত্বে তুরস্কের মৌলবাদী খলিফাদের সমর্থনে ভারতে যে খিলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, গান্ধীজীই ছিলেন তার মূল প্রবক্তা। ঐ আন্দোলনে কি পরোক্ষভাবে এটাই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল-না যে মুসলমানরা এদেশে আলাদা জাতি। বিপিনচন্দ্র পাল সে সময় এই আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের প্রথম পরিচয় হওয়া উচিত ভারতীয় হিসাবেই। ধর্ম বা জাতি-পরিচয় পরে বিবেচ্য। যদিও সমান সম্মানের সঙ্গে প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধর্মের আচার বিচার পালন করতে পারবেন। বিপিনচন্দ্র খিলাফত আন্দোলন প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন যে কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের পক্ষেই বাইরের কোনো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখানো এবং তার সঙ্গে ভারতের নিজস্ব স্বাধীনতার দাবীকে সংযুক্ত করার ফল ভাল হবে না। ভাল যে হয়নি, তা অচিরেই প্রমাণিত হয়েছিল এবং গান্ধীজীকে খিলাফত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল।

আজ, এতদিন পরেও, ধর্মকে আমরা রাজনীতির ক্রীড়নক হতে দিচ্ছি। আসলে গণতন্ত্র গণতন্ত্র করে চেঁচালেও আমরা আর্থিক সমতা ও সামাজিক সংস্কারমুক্তির লক্ষ্য থেকে এখনো বহু বহু দূরে। ভোটের সময় ছাড়া সাধারণ মানুষ থেকে দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রাদের দূরত্ব একচুলও কমেছে বলে মনে হয় না। এ কথা আজ আর

অস্বীকার করে লাভ নেই স্বাধীনতার পরে মুসলমান বা অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়কে যতটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল, তাদের তা দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার বেয়াল্লিশ বছর পরেও জাতীয় সরকার যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নতির জন্য স্থায়ী কিছু করে উঠতে পারেননি সেটা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এখনো সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য যে আসন সংরক্ষিত হয় সেটা তাদের পক্ষে একধরনের অপমানেরই নামান্তর। সরকার অনুন্নত শ্রেণীর মূল সমস্যাগুলির দিকে তাকিয়ে সত্যিকারের সমৃদ্ধির জন্য কিছুই করেননি। সত্যিকারের উন্নতি ঘটলে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য এতদিন পরেও আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন হতো না। শুধু অঢেল অনুদান সমস্যার সমাধান নয়। তাছাড়া অনুদানের শতকরা কত ভাগ সঠিক প্রার্থীর কাছে পৌঁছোয়!

গান্ধীজীর পরবর্তী প্রজন্মের নেতারা সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে তেমন চক্ষুষ্মান হলেন কই? ধর্ম ধর্ম করে চেঁচিয়ে তারা অনুন্নত সম্প্রদায় ও অহিন্দু জাতিদের আর্থ-সামাজিক ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিকে এড়িয়ে, শুধু রাষ্ট্রপতি পদে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বর্ণের নেতাকে বসিয়ে পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করতে চাইলেন—অহো! আমরা ভারতবাসীরা কি নিদারুণ ভাবে অসাম্প্রদায়িক ও জাতপাতবিচারমুক্ত। অবিলম্বে রাজনীতি ও ধর্মের সম্পূর্ণ বিযুক্তিকরণ না ঘটলে সমস্যা আরো দ্রুত বাড়বে। যে দেশে প্রতি একশো কিলোমিটারের পর-পরই ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পরিচ্ছদ, এমনকি উপাস্য দেবতাও পাল্টায়, সেই দেশকে একত্র গ্রথিত রাখা এমনিতেই দুরূহ। তার ওপর এই গভীর দুঃসময়ে যদি প্রত্যেক ধর্মকেই তাদের নিজস্ব ডুগডুগি অবাধে বাজাতে দেওয়া হয় তাহলে দেশের মানচিত্র ক্রমশই ছোট হয়ে আসবে একসময়। এই মূল শংকাটি স্মরণ রেখে যে-কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামিকে শুরুতেই নির্মম হাতে স্তব্ধ করে দিতে হবে। যদি ধর্মনেতাদের গ্রেপ্তারকে এর শুরু বলে ধরি, তবে সরকারকে অভিনন্দন জানাতেই হয়।

বিভাবের আগামী পঞ্চাশতম শারদীয় সংখ্যাটি সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ এ সংখ্যার অন্যত্র আছে। আশা রাখি আনুমানিক সাতশো পৃষ্ঠার আয়তনবান এই সংখ্যাটি আগামী শারদ অবকাশে বাঙালি পাঠকের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠবে।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

বিভাব সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা

আগামী সেপ্টেম্বরে বিভাবের চোদ্দ বছর পূর্ণ হবে। একই সঙ্গে প্রকাশিত হবে সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশে আমরা একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছি। বিভাবে শুরু থেকেই গভীর অনুধাবনযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রকাশের প্রাথমিক বছরগুলিতে বিভাব মূলত প্রবন্ধেরই পত্রিকা ছিলো। সাহিত্যের অন্যান্য শিল্পদিকগুলি পরে ক্রমশ সংযোজিত হয়েছে। বিভাবে প্রকাশিত কিছু কিছু প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই কিংবদন্তীতে পরিণত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, এমনকি রেডিও, টেলিভিশন ও নানান সাহিত্যসভায় বিভিন্ন সময়ে বিভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ঘুরে ফিরেই বারবার এসেছে এবং এখনো আসছে। অনেকেই তাঁদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলি সমগ্রমত সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। গবেষকদের এই প্রবহমান অনুরোধে বিশেষ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাটি ১ থেকে ৪৯ সংখ্যা অবধি প্রকাশিত সমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের একটি সুনির্বাচিত সংকলন হিসাবে প্রকাশিত হবে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর এই প্রত্যন্তপ্রান্ত অবধি বাঙলা, বাঙালি ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতমানসের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন হবে এই সংখ্যাটি।

আনুমানিক সাতশো পাতার এই সুবৃহৎ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাটিতে লিখেছেন: সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, অশোক মিত্র, রাধারমণ মিত্র, নিশীথরঞ্জন রায়, শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার, অরুণ মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, লীলা মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনয় ঘোষ, দেবীপদ ভট্টাচার্য, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, সুধী প্রধান, প্রদোষ দাশগুপ্ত, অলোক রায়, শিশিরকুমার দাশ, সুধীর চক্রবর্তী, শোভন সোম, সুবীর রায়চৌধুরী, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু দে, বিনয়ভূষণ রায়, পিনাকী ভাদুড়ী, আবদুর রউফ, গুণানন্দ ঠাকুর, অরুণকুমার ঘোষ, কেতকী কুশারী ডাইসন,

সুলতান আলী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পথিক বসু, সন্দীপ সরকার ও আরো অনেকে।

অঙ্গসৌষ্ঠবে ও অন্যান্য নানান আকর্ষণে আকর্ষণীয় এই সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাটির মূল্য হবে পঞ্চাশ টাকা। সীমিত সংখ্যায় ছাপার কারণে বিভাবের গ্রাহক ছাড়া বাইরে মাত্র একহাজার পাঠক এই সংখ্যাটি সংগ্রহের সুযোগ পাবেন। অগাস্টের ১৫ তারিখের মধ্যে উৎসাহী পাঠক-ক্রেতারা বিভাব দপ্তরে ২০ টাকা জমা দিলে এই বিশেষ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাটি পরে মাত্র ১৫ টাকায় (মোট ৩৫ টাকায়) পাওয়া যাবে। বিভাব সম্পাদকীয় দপ্তর ছাড়াও কলেজ ষ্ট্রিট এলাকার দু-তিনটি দোকানেও নাম নথিভুক্ত করা যাবে, যার বিস্তারিত বিবরণ জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্র মারফৎ জানানো হবে। যে সব গ্রাহক ডাকযোগে এই সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাটি পেতে চান তাদের অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য বিভাব সম্পাদকীয় দপ্তরে লিখুন।

Space Donated

by

A Well Wisher

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ও শিক্ষকের কর্তব্য

অশীন দাশগুপ্ত

অনেকেরই ধারণা যে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সুশিক্ষায় দূর করা সম্ভব। সেজন্য এই ব্যাপারে শিক্ষক সমাজের বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। বহু বছর শিক্ষাদান করার ফলে আমার ধারণা শিক্ষা আমরা যা' দিই এবং যেভাবে দিই তাতে কোনো সমস্যাতেই বিশেষ ফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে আরও কম। তবু বিশ্বাস করি এই সমস্যার সমাধানে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেন, সেকথা বলছি।

সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে আমরা, কিছু লোক, ইতিমধ্যেই মন স্থির করেছি। এর মধ্যে এক অংশের লোক সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, অন্য দল অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীরাই এই সমস্যাকে সমস্যা হিসাবে দেখতে পান এবং এই সমস্যার সমাধান খোঁজেন। বিশ্বাসীরা অবশ্য নিজেদের সাম্প্রদায়িক মনে করেন না। এমন ক্ষেত্রে প্রায়ই যা ঘটে থাকে : তাঁরা নিজেদের সত্যবাদী বলে দেখেন ও অন্যমতের লোককে সুবিধাবাদী বলেন। সাম্প্রদায়িক মানুষেরা বুদ্ধিমান হতে পারেন। এঁদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের কমতি নেই। যুক্তি, তর্ক বা তথ্য দিয়ে এই লোক-গুলিকে অসাম্প্রদায়িক করবার কোনো উপায় দেখি না। একটা উদাহরণ দিলে এই বিশেষ সমস্যা পরিষ্কার হতে পারে। কোনো সাম্প্রদায়িক হিন্দু মনুষ্যকে যদি বলেন, ভারতবর্ষের সংবিধান তো 'সেকুলার', আপনি সেই সংবিধান মানেন, আপনি কেন সেকুলার নন ? তাঁর উত্তর তখন এইরকম হতে পারে : 'আমি হিন্দু এবং প্রকৃত অর্থে সেকুলার। যে মুসলমান তাকে হিন্দু করে নিতে আমার কোনই আপত্তি নেই। এই উদারতাই ভারতীয় অর্থে, সত্যকার সেকুলারিজম। ধর্ম-নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষে অচল।' এই লোকটিকে বোঝানোর জন্য যদি অভিধান খোলেন, নিষ্ফল হবেন। লোকটি আপনার মতই বুদ্ধিমান, লোকটি শিক্ষিত এবং লোকটি বিশ্বাসী।

অবিশ্বাসী মানুষদের বোঝানোর প্রয়োজন নেই। মনে হয় এই ছোট দলটি নিজেদের মধ্যে সভা করে মাঝে মাঝে নিজেদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে

সাম্প্রদায়িকতা বস্তুটা খারাপ। যেহেতু বিশ্বাসী লোকেরা বড়ো একটা এ-সব সভায় আসেন না, আলোচনায় সত্যকার লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তবে, অবিশ্বাসী মানুষ নিজের অবিশ্বাস আরেকটু জোরালো করে বাড়ি যান। এমনও হতে পারে যে একজন আরেকজনের কাছে কিছু শেখেন। দলটা ছোট। সভা করলে বোধহয় দলে ভারি লাগে।

আমার ধারণা অধিকাংশ মানুষ এই রকম বিশ্বাস, অবিশ্বাসের ধার ধারেন না। এ ব্যাপারে কোনো সমীক্ষা নেই। সমীক্ষা থাকা বোধ করি সম্ভবও নয়। কিন্তু এটা আমার বিশ্বাস। বক্তব্যের শেষে এই বিশ্বাস বস্তুটিতে আবার ফিরে আসব। এখন সংক্ষেপে বলি যে সত্যকার দলে ভারি এই অজ্ঞেয়বাদী লোকগুলিকে শেখানোর দরকার আছে। এবং এই দরকারটার জন্যই শিক্ষকদের দরকার। তবে কিনা বলে রাখা ভালো যে শিক্ষকেরা সমাজ-হারা কিম্ভূত কোনো পদার্থ নন। তাঁরাও এই ভারতীয় সমাজের মানুষ। তাঁদের মধ্যেও বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞেয়দের দল আছে। শিক্ষা বস্তুটা যদি এমন হতো যে সর্ব রোগে ধন্বন্তরি পাঁচনের মতনই ছাত্রকে গলাধঃকরণ করানো চলত তা'হলে বেশ ভালো হতো। কে শেখাবে, কি শেখাবে, কে শিখবে এ সব জ্বালাময়ী প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু প্রশ্নগুলি আছে। প্রয়োজনটাও আছে।

শিক্ষক গোষ্ঠীর সামাজিক চেহারা থেকে আমরা সমাজের সাধারণ একটা ব্যবস্থার দিকে মন দিতে পারি। আমাদের এই ভারতীয় সমাজ বস্তুটি বিশাল একটি মৌচাকের মতন চিরকালই ছিল এবং আজও অনেকটাই আছে। মৌমাছি মৌচাকের বিভিন্ন খোপে আলাদা আলাদা থাকে, এমন শুনেছি। ভারতীয় মানুষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খোপে আলাদা আলাদা থাকে, এমন দেখেছি। শুধু যে বিভিন্ন ধর্ম আলাদা থাকে, তা' নয়। উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ থেকে পৃথক বাস করে। বাঙালি ও গুজরাটি কলকাতায় মেশে না। এ-জন্য কেউ কিন্তু দায়ী নয়। আপনি ধরলাম হিন্দু, মধ্যবিত্ত, বাঙালি। যতই চেষ্টা করুন না কেন আপনি মুসলমান, নিম্নবিত্ত, গুজরাটি সমাজে বাস করতে পারবেন না। আপনি যতই আলোকপ্রাপ্ত হন না কেন, আপনার সমাজটা সে জন্য তৈরি নয়। সমাজ যদি মানেন, তাহলে বাস-স্থানটাও মানতে হয়। আপনি 'নিজের' লোকের মধ্যে থাকবেন, 'নিজের' লোকের সঙ্গে মিশবেন এটাই সমাজের নিয়ম। সেজন্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কথা যদি ভেবে দেখেন তাহলে ভারতীয় সমাজের সাম্প্রদায়িক জীবনধারাটা বুঝতে পারবেন। সাম্প্রদায়িকতা বলে যে বিষাক্ত মেজাজের আজ আমরা ভয় পাচ্ছি,

এ জিনিস সে জিনিস নয়। কিন্তু সেই বিষের মূল যদি খোঁজেন, সেই বিষ কেন সমাজ থেকে যায় না এই প্রশ্ন যদি তোলেন তাহলে ভারতীয় সমাজের এই 'সাম্প্রদায়িক' জীবনধারায় আপনাকে থামতে হবে। সমাজের এই মৌচাকটা যত-দিন না ভেঙে দেওয়া যাচ্ছে ততদিন মধু আপনার ভাগ্যে জুটবে না।

উপমাটা আরেকটু ঠেলছি। মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে, চাকে রেখে দেয়, তাদের মাথার উপর মক্ষিরানী থাকেন, এটাই শুনেছি মৌচাকের জগৎ। ভারতীয় সমাজ আজ হাজার পাঁচেক বছর হলো এই কাঠামোটা মেনে চলেছে। খোপগুলি আলাদা। অধিবাসীরা নিজের কাজে ব্যস্ত। কেউ কারুর ব্যাপারে নাক গলায় না, হুল ফোটানো নিষেধ। ভারতীয় ইতিহাসের এই শিক্ষা, ভারতীয় সহিষ্ণুতার এটাই মূলমন্ত্র। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ এবং রাজা মৌচাকের জগতটাকে সামলাতেন। পরে সুলতান বা বাদশা কিছুটা করলেন, হিন্দুদের ব্রাহ্মণ রইলেন, মুসলমানদের মোল্লা! মৌচাকের সহাবস্থানটা ছিল। ভারতীয় সহিষ্ণুতা এই সহাবস্থানের উপর তৈরি। যদি ভেবে দেখেন, সম্প্রদায়কে মেনে, সম্প্রদায়েরই ভিত্তিতে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা অস্বীকার করে এই ইতিহাস তৈরি।

আধুনিক যুগে ঢুকে ইতিহাসের অসুবিধা হলো। সহাবস্থানের মূল কথা একে অন্যের আচার বা অর্চনায় হস্তক্ষেপ না করা। আধুনিক রাষ্ট্র এই সংযমে বিশ্বাস করে না। শিশুর দুধ থেকে বৃদ্ধের শ্মশান রাষ্ট্রের করুণা-প্রার্থী। রাষ্ট্রটিকে আপনি ভোট দিয়ে অবশ্য শায়েস্তা করতে পারেন; অর্থাৎ কিনা আপনার সম্প্রদায়ের মতন করে তৈরি করে নিতে পারেন। এই ব্যাপারটিতেই অন্য সম্প্রদায়গুলির আতঙ্ক। তারা আপনাকে বিশ্বাস করে না। এর থেকেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি।

সম্প্রদায় থেকে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি নয়। আতঙ্ক থেকে এই বিষ এসেছে। মানুষ ভয় পাচ্ছে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ভয় পাচ্ছে। জীবন-ধারা সমাজে এখনও সম্প্রদায়-ভিত্তিক। কিন্তু বাস্তব জগতটা এই জীবনের চারিপাশে পালটে গেছে। রেল বসেছে। মাঝে মাঝে চলে। ডাক এসেছে। মাঝে মাঝে আসে। সিনেমা, খবরের কাগজ, রেডিও, এখন টেলিভিশন, ডাক কিংবা রেলের চাইতেও আমাদের নিত্যসঙ্গী। সম্প্রদায়ে আমাদের বাস। কিন্তু অখণ্ড একটা বিশ্বজগৎ আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে। মৌচাক ভাঙছে কিন্তু ভাঙা এখন অনেক বাকি। এই ভাঙার ব্যথার একটা চেহারা আজকের সাম্প্রদায়িকতা। আমার বিশ্বাস, আগেও বলেছি এখনও বলছি, এই বিষের ওপারে মধু আছে, এই ব্যথার শেষে আনন্দ আছে। কিন্তু এই উত্তরণে ভারতবাসীকে নিজেদের সংসারটা ঢেলে সাজাতে হবে।

সংসার পালটানোর কাজটা আমাদের অজান্তেই শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রথম আমাদের শোচনীয় কিছু জ্ঞান হলো। ভেবেছিলাম আধুনিকতার অভিঘাতে ভারতবর্ষে শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিত এই মধ্যবিত্তেরা পশ্চিম এবং পূর্বের যা কিছু ভালো আছে সবটুকু যোগাড় করে সমাজকে ঢেলে সাজাবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগে যেন শুধুই মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদয়। তা' কিন্তু না। এখন বুঝতে পারছি যে আধুনিকতার পরিবেশে মৌলবাদের অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। মৌলবাদ একটা মেজাজ। এই মেজাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকলেই যোগ দিতে পারেন, যোগ দিচ্ছেন। মৌলবাদ একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এর সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক সামান্য। ঈশ্বরের নামে মৌলবাদীরা কথা বলে, ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য সমাজে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখা, তাদের দাবি দাওয়ার তদারক করা। আগেই বলেছি যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে, সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র এসেছে, গণতন্ত্র উপস্থিত : সব মিলিয়ে পৃথক সম্প্রদায়গুলিকে আর পৃথক রাখা যাবে কি না এ-বিষয়ে ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই ব্যাপারে মৌলবাদ সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার শেষ এবং মারাত্মক চেষ্টা। আধুনিকতা যেমন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীকে তৈরি করেছে, আধুনিকতা তেমনই মৌলবাদী মন তৈরি করেছে। সংঘাত সেজন্য দু'রকম। প্রথম, সম্প্রদায়-ভিত্তিক জীবন-ধারা ক্রমেই অচল হচ্ছে, বাস্তব পরিবেশ পালটে গিয়েছে। দ্বিতীয়, এই পরিবেশে সম্প্রদায়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মৌলবাদের উদয় হয়েছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতা নতুন পরিবেশের একমাত্র ধর্ম। কিন্তু পুরানো নতুনকে পথ ছাড়বে না বলে বদ্ধপরিকর। এটার প্রকাশ সাম্প্রদায়িক সমস্যা।

এই সমস্যায় ধর্ম-নিরপেক্ষ মানুষকে সাবধান হতে হবে। প্রত্যেক ধর্মের একটি উদার দিক আছে; বিশেষ করে হিন্দু-ধর্মের উদারতা সর্ববিদিত। এই উদারতা এবং অসহিষ্ণুতাও মৌলবাদ পৃথক এবং এদের পৃথক রাখতে হবে। ধর্মের যা-কিছু ভালো ধর্ম-নিরপেক্ষ মানুষকে সযত্নে সেটা কুড়াতে হবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে অন্য পথ নেই। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ দেউলিয়া। রেনেসাঁস শেষ হয়ে গিয়েছে। রেনেসাঁসের প্রবক্তারা, রামমোহন থেকে জওহরলাল আজ সকলেই গত হয়েছেন। সমাজে ঠাহর করে দেখলে উঁচু মানুষ প্রায় চোখে পড়ে না। এই অবস্থায় মধ্যবিত্তেরা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আগে বলেছি মৌলবাদ একটা মেজাজ। কিছু মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মানুষ এই মেজাজের অংশীদার। শ্রেণীর বাইরে এরা বন্ধু খুঁজছে। কিছু মধ্যবিত্ত মানুষ অন্যদিকে শ্রেণীর বাইরে বন্ধু খুঁজছে।

এরই মধ্যে ঘটে চলেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইদানীংকার সব চাইতে চমকপ্রদ ঘটনা : নিম্নবিত্তের অভ্যুত্থান। মধ্যবিত্ত বন্ধু খুঁজলে এদের মধ্যেই খুঁজবে।

নিম্নবিত্ত মানুষ মনস্থির করেনি। কিছু অভ্যাস রয়েছে সেগুলি সাবেকি। এই অভ্যাসগুলি থেকে একধরনের সাম্প্রদায়িকতা সহজেই আসতে পারে। মৌলবাদ সেই সুযোগ খুঁজছে। এঁদের মন নিরপেক্ষ করাই, এই সূত্রে শিক্ষার প্রধান কাজ বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাঙন বর্তমানে শিক্ষার সব চাইতে বড়ো প্রতিবন্ধক বলে মনে করি। শিক্ষকেরা নিজেরাই অনেক বিষয়ে মনস্থির করেননি। কিছু শিক্ষক বিশ্বাসী, কিছু অবিশ্বাসী। এঁদের শিখিয়ে লাভ নেই বা লাভ কম। যে বিরাট দলটা মনস্থির এখনও করেননি তাঁদের বুঝতে হবে সমস্যার চেহারাটা কী। এঁরা বুঝলে তবে অন্যকে বোঝাতে পারবেন। শিক্ষার কর্তব্য ফুরিয়ে যায়নি। আরও জটিল রূপ নিয়েছে। আরও যেন অবশ্য প্রয়োজনের মধ্যে এসেছে।

সুবিনয় ধরের কবিতা

হেমোপম দস্তিদার

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ধরন থেকে একটু আলাদা সুবিনয় ধরের এই একগুচ্ছ কবিতা। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লেখা তাঁর কবিতা থেকে এই নির্বাচন। কবির মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পরে প্রকাশিত হচ্ছে কবিতাগুলো। বারো বছর আগে প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ—'সময়ের অন্ধকারে স্মৃতির বিদ্যুতে'—ছাড়া আর কোথায়ও এই কবির কবিতা বিশেষ ছাপা হয়নি। স্বভাবে অন্তর্মুখী সুবিনয় কবিতা লিখেছেন অনেক। কিন্তু এক-ধরনের সঙ্কোচ ও তৎপরতার অভাবে পত্র-পত্রিকার পাতায় ক্বচিৎ তিনি উপস্থিত হয়েছেন।

অথচ কবিতার জন্য এক দুর্মর ভালোবাসা ছিল তাঁর। আত্ম উন্মোচনের তাগিদে কবিতা লেখাও থেমে থাকেনি কখনো, এমনকি মৃত্যুর অল্পদিন আগেও, দীর্ঘ চোদ্দ বছরের স্নায়ু বৈকল্যের ঘোর থেকে সাময়িক মুক্তির অবকাশে তিনি কবিতা লিখেছেন। বলা যায়, এক অর্থে কবিতা ছিল তাঁর জীবনের এক স্থির ডাঙা, যেখানে অতল অবসাদ ও নিঃসঙ্গতা থেকে মাঝে মাঝে তিনি আশ্রয় পেয়েছেন। এক স্বরচিত শব্দের সংসারে বাস করেছেন তিনি, বাঁচার অর্থময়তাকে খুঁজেছেন।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ধরন থেকে সুবিনয়ের কবিতাকে আলাদা বলে উল্লেখ করেছি গোড়াতেই। এখনকার বেশিরভাগ কবিতাই সাবেকি মিল, ছন্দকে এড়িয়ে চলে। অমিল পয়ারই তার প্রধান অবলম্বন। অন্ত্যমিল ক্বচিৎ দেখা যায় কোনো কোনো কবিতায়। আর রচনাভঙ্গির ক্ষেত্রে আজকাল অনেক কবিতাই অসংযত শব্দমালা, চিত্রকল্পেও উৎকেন্দ্রিকতার স্বেচ্ছাচার যা, মনোযোগী পাঠককেও নিরাশ করে। সুবিনয় এ পথে হাঁটেননি। পরিমিত, সুবোধ্য বিন্যাসে সম্পূর্ণ শিল্পরূপেই তাঁর আগ্রহ। অনুভব বা বেদনাকে ধাপে-ধাপে তিনি গড়ে তোলেন শব্দে, সংগীতে, চিত্রে। ছন্দ, মিলে তাঁর বিশ্বাস। এদিক থেকে রবীন্দ্রোত্তর অন্যতম প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে তাঁর কবিতায়।

সুবিনয়ের কবিতায় একটি স্পন্দিত আবেগকে ছোঁয়া যায়। তাঁর কবিতার আবেদন আন্তরিক গাঢ় উচ্চারণে। এই আন্তরিকতায় গাঢ় কণ্ঠস্বর পাঠককে স্মরণযোগ্য কবিতাংশ উপহার দেয় বারবার। ছন্নছাড়া সময় ও পরিবেশের কুহকে দিশেহারা এই কবি জীবনানন্দ-কীর্তিত 'অদ্ভুত আঁধার'-কে দেখেছেন। অপচয়, ক্ষয় ও মৃত্যুর আঁধার তাঁর অনেক কবিতায় একটি আর্ত পরিমণ্ডল রচনা করেছে। প্রেমের মৃত্যু, আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর করুণ সুর ধুঁয়োর মতো আবর্তিত এইসব কবিতায়।

সংকট ও মুক্তির এই টানাপোড়েন লক্ষ করি সুবিনয়ের কবিতায়। মাঝে-মাঝে নিরাশা নিয়তির মতো চেপে বসে তাঁর চিন্তায়। আবার জীবনের টানে তিনি পথ খোঁজেন, এক 'স্থলপদ্ম ভোরের স্বপ্নে, উজ্জীবিত হন স্মৃতি প্রেম ও নিসর্গের উদ্বোধনে জীবনকে খুঁজে বেড়ান।

এক অকৃত্রিম আবেগের সুরে বাঁধা এইসব কবিতায় তাঁর কণ্ঠস্বরের আন্ত-রিকতা আনন্দ বা বিষণ্ণতাকে সমান ধনী ও গরিমামণ্ডিত করে তুলেছে। এমন ঋংকৃত সংবেদন শিক্ষিত কাব্যপাঠকের সমাদর পাবে, এই আশা বেশি নয়।

কারো কারো নিষ্ক্রমণ

সহজেই কারো কারো নিষ্ক্রমণ ঘটে
যেন অনায়াসে নেমে যাওয়া জনশূন্য স্টপে
মাঝরাতে ফাঁকা ট্রাম থেকে।
অথবা সন্ধ্যার ঝোঁকে সুবাসিত, পরিচ্ছন্ন এবং সস্ত্রীক
ঘণ্টা দুই ময়দানে প্রফুল্ল ভ্রমণ
তৃপ্ত হয়ে ঘরে ফেরা, ততোধিক তৃপ্ত জাগরণ
প্রত্যহ সকালে। কেউ কেউ এমন সহজ পারঙ্গম।

কেবল তুমিই পথ হারালে পথিক
চন্দ্রোদয় সূর্যাস্তের গূঢ় মন্ত্রণায়
হতভম্ব ট্র্যাফিকের মিছিল-জনতার
বহুমুখী খরসান স্রোতে
তোমারই নৌকা শুধু অচঞ্চল, এবং অস্থির।

এই ঘূর্ণি—চীৎকৃত, কুটিল—এর থেকে
কী করে বাঁচাবে নৌকা? কী কৌশলে
পৌঁছে যাবে দুপুরের ছায়াঘন সকরুণ ঘাটে?
যেমন ফেরেন সমে আমীর খাঁ সাহেব
অসম্ভব কূটতান সরগমের ব্যূহ ভেদ করে
সাবলীল প্রায় খেলাচ্ছলে
তেমন ক'জন পারে? বস্তুতঃ নীলিমা
প্রায়শঃ আচ্ছন্ন থাকে ধুলোয় অঙ্গারে
ক্রোধে টিটকারির ঝড়ে। তুমি তাই
বিরল সে ভাগ্যবান লোকদের মতো
সহজে নিষ্ক্রান্ত হতে পার না কিছুতে
না তোমার ঘর থেকে সামনের পথে,
না কুটিল সময়ের চক্রবেড় থেকে অন্য শুভ্র কালাতীতে।

কারো কারো নিষ্ক্রমণ সহজেই ঘটে
যদিও বেশীর ভাগই চলচ্ছক্তিহীন।

সম্মোহন

প্রায়শঃই এ রকম হয়
মধ্যপথে ভুলে গিয়ে মুখস্থ ভূমিকা
মঞ্চ হতে অন্তরালে সরে যেতে হয়
এ রকম প্রায়শঃই হয়।

তখন দর্শককুল ধিক্কারে মুখর
বঞ্চনার শোধ তোলে কুটিল বিদ্রূপে,
কেউ কেউ তীব্র রোষে ইঁট কাঠ ছোঁড়ে
প্রভাময় দীপাবলি নেভায় নিমেষে—
হতাশার তিক্ত ভাষা কোলাহলে একাকার হয়ে
যবনিকা ভেদ করে বিষমুখ তীরের মতন।

অথচ এ সব কিছু যাকে লক্ষ্য করে
সেই আমি, পরাজিত, করুণ নায়ক
ততক্ষণে সমর্পিত অন্যতর গূঢ় সম্মোহনে।
বস্তুতঃ সকল তীর ফিরে চলে যায়
মন্ত্রঃপূত বর্মে লেগে হতমান লাজে
এবং ভুবন ভরে দূরাগত কিন্নর সঙ্গীতে।

যেন বা তন্দ্রায় শুনি মাঝিদের গান
নোঙর তোলার শব্দ জোয়ারের ছলাৎ ছলাৎ
দাঁড়ের সহসা ঘায়ে জলের বিলাপ
যাত্রীদের ইতঃস্তত বিদায়-ভাষণ, আর
অনুকূল বাতাসের কুশল-সংলাপ
বলাকার উপমান স্ফীতসুখ পালে।

তখনই যেন বা আমি ফিরে পাই
লুপ্ত রাজ্যপাট, ফিরে পাই
অপহৃত স্বর্ণসিংহাসন, ফিরে পাই
কল্যাণার্থী অগণিত ভক্ত প্রজাকুল।

প্রায়শঃই এ রকম হয়
মধ্যপথে ভুলে গিয়ে শেখানো সংলাপ
মঞ্চ থেকে অগোচরে সরে যেতে হয়—
এ রকম প্রায়শঃই হয়।

প্রত্যাবর্তন

সে আজো বেড়ায় ঘুরে দূরে
ভোলে পথ আজো বার বার
আশ্বিনের নদীতীরে এসে
দেখে, ছেড়ে গেছে খেয়া।

কিছুতে হয় না ফেরা ঘরে
রূপসী মেঘের দল বিপথে ভোলায়

ঝাপসা হয়ে বৃষ্টি নামে, মোছে গঞ্জ গ্রাম
অগাধ শূন্যতা নিয়ে চিল-ডাকা আকাশ ঝিমায়।

হয়তো ফিরবে কোনদিন
মেঘ বৃষ্টি ভ্রান্তি পার হয়ে
ধন্য হবে কোজাগরী, ভোরের রাস্তায়
নেমে যাবে দলে দলে উৎফুল্ল শিশুরা।

যে কথায়

যে কথায় ফুল ফোটে সে কথা জানি না,
যে কথায় সূর্য ওঠে সে কথা জানি না,
আসলে আসল কথা জানাই হলো না
বিকেল অমোঘ যায় গোধূলির দিকে।

কলমকে বলি তাই—তুমি চুপ করো
এখন গভীর রাত—ঘুমুচ্ছে সবাই—
শান্তি কারো বিঘ্নিত করো না।

খুব সূক্ষ্ম স্নায়ু-তন্ত্র দিয়ে গড়া দেহ,
দেহের ভেতরে মন, আঘাত করো না,
যদি করো ভূমিকম্পে তোমার পৃথিবী ধ্বসে যাবে।

ফেরা

আমার বিরহে তোমারও শান্তি নেই
কেন যে বোঝ না এই এক বিস্ময়।
শোননি কখনো পাখিও হারায় থেই ?
ভোরের আকাশে লাগে না সঠিক সুর ?

আমার বিরহে তোমারও শান্তি নেই
পূরবী-বিভাসে তাই তো অনড় আড়ি
তাইতো মিছিলে যোগাযোগ-সেতু গড়া
নিশান ওড়ানো বিজন শূন্য বুকে।

আমার বিরহে আকাশেরও ঘুম নেই
জলে যায় তৃণ জলে যায় তরুতল,
নামে না লাঙল মাঠেও চরে না গাভী
পথিকও পায় না বটের প্রবীণ সেবা।

তোমার ফেরার সময় হলো না আজো
খর বিচ্ছেদ শানায় পিশাচে, প্রেতে,
চলাচল পথ আগাছায় পড়ে ঢাকা
মিলায় হাওয়ায় মিনারেরও আহ্বান।

এ পথে ফিরবে বলেছিলে, ভুলে গেলে ?
আমারও সময় বিকল পক্ষাঘাতে
জানালার ফ্রেমে স্তম্ভিত মহানিম
ধীরে পাশ ফেরে বিশাল অন্ধকার।

তৃতীয় নয়ন

যখনই চোখের কাছে যখনই কানের কাছে
ছুটি নিই গন্ধঘন বিরল বেলায়
উৎসবের লগ্ন আসে রাজ সমারোহে
অন্ধকার জ্বলে, বাজে আলোর শানাই।

যেমন পাখিরা গায় আকাশের সংগীত-সভায়
সেরকম না হলেও প্রায় তুলনীয়
স্বতঃস্ফূর্ত হার্দ্যতায় দ্বিপ্রহর সান্দ্র হয়ে যায়,
ফুলের উল্লাস হয় অনিবারনীয়।

সে সব বিরলক্ষণে নীলকান্ত সমুদ্রের বুকে
যাত্রা করে দলে দলে উজ্জ্বল জাহাজ,
দিক থেকে দিগন্তরে ছুটে যায় তেজী অশ্বদল,
বাতাসকে দীর্ণ করে শঙ্খের আওয়াজ।

সে সব নিবিড় লগ্নে অনায়াসে যুদ্ধ জয় হয়
পযুর্দস্ত পড়ে থাকে ধুলার উপরে
অন্ধকার পুরোহিত, রক্তাপ্লুত এবং কুৎসিত
যে আমার কানে শুধু ভুলমন্ত্র পড়ে।

চক্ষুকান বন্ধ হয়ে ফোটে যেই তৃতীয় নয়ন
যে মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ের অধিক শ্রবণ
জেগে ওঠে, জলে আলো অকস্মাৎ নীলিমার স্নেহ
ঝরে যেন বৃষ্টিধারা—স্নাত হয় মন।

আমি তাই কৃতাঞ্জলি, হে আমার তৃতীয় নয়ন
হে শ্রবণ অতীন্দ্রিয়, হে সান্দ্র প্রহর,
ফুটে থাকো শতদলে, জেগে থাকো অন্তরে গভীর,
মরুক সে, যে আমার অন্ধ সহোদর।

এই রাত্রি

চিত্রার্পিত নদীতীর নিঃসঙ্গ মাস্তুল
সীমাহীন শূন্যতার অসংখ্য তোরণ
একে একে খুলে দিয়ে গেল
গীর্জার ঘণ্টার দূর অশরীরী ধ্বনি
স্মৃতির সকল মুখ ক্রমশঃই বর্ণহীন
ক্রমশঃই রেখারিক্ত কুয়াশা-ধূসর।

বুঝি বা রাত্রিই শুধু অপরূপা অস্তিত্বশালিনী।

বুঝিবা নৈঃশব্দ তবে দিকে দিকে
একমাত্র বিশুদ্ধ চেতনা শেষতম জ্যোতি
বুঝিবা উজ্জ্বল নদী, নদীর আশ্বাস
দৃষ্টি হতে দৃষ্টির গভীরে নীল স্বপ্ন হয়ে
আজ শুধু বারবার প্রাণপণ মুছে দিতে হবে।

অথচ তবুও শব্দ, শব্দের অন্তরে
অমল আশ্বিনমাখা শতদল-আলো
কোনমতে বেঁচে থাক কোনোদিন কেউ পেয়ে যাবে
আজ যত অন্ধকার এই বুঝি ভালো।

আপাতত এই রাত্রি এই শূন্য নৈঃশব্দের মেঘ
অমেয় গীর্জার ঘণ্টা অকূল হৃদয়।

কোথাও স্রোতস্বিনী

কোথাও স্রোতস্বিনী রয়ে গেছে
দেখা তার পাই বা না পাই,
নিয়তই উৎসারিত অমল সংগীত
আমি জানি বা না জানি,
চলে যাওয়া নিয়তই স্বধর্ম-স্বভাবী।

আমি তার খোঁজে এই অস্তিত্ব আমার,
অস্তিত্বের দীর্ঘ এই বর্ষ দিন মাস
আকৈশোর এ জীবন
পথে পথে দিলাম ছড়িয়ে—
শিশির নিয়েছে কিছু,
কিছু নিল বৈশাখের রোদ,
আর কিছু নিয়ে গেছে
নামহীন সনাতন ধুলি।

কোথায় সে রয়ে গেছে?
কণ্টকিত বনে কিংবা অন্ধ গর্ভাশয়ে?
অথবা এ পরিচিত, পুরাতন
দিগন্তের অত্যাচারী প্রাচীর পেরিয়ে?

এখনো পাইনি তার দেখা।

তার খোঁজ পাই যদি একবার, এই শেষবার
ঘাটে ঘাটে উঞ্ছবৃত্তি এ-মুহূর্তে ছাড়ি,
একবাক্যে দিয়ে আসি
দেনা-পাওনা সমস্ত চুকিয়ে।
আমি তবে সব ঘৃণা, সমস্ত মিনতি
অনায়াসে শূন্য থেকে নিচে ছুঁড়ে দিই,
একলাফে পাটাতনে উঠে
খুলে দিই দড়াদড়ি,
তুলে ফেলি অটল নোঙর।
বন্দরের স্থির লক্ষ্যে
আমি তবে ভাসাই জাহাজ।

আশ্বিনে

আজ পুনরাগত আশ্বিনে
কার মুখ সকালের রৌদ্রে ঝলমল ?
বাতাসে কিসের গন্ধ ? লুপ্ত কোন
শৈশবের, কৈশোরের শিউলি কি একই রকম ঝরে
সোঁদা, ঝাপসা ভোরের রাস্তায় ?

কবে যেন কেঁদেছিল প্রাণ
ঢাকের করুণ বাদ্যে হু হু জল এসেছিল চোখে
ডুবে গেলে ডাকের প্রতিমা ভরা বিলে।
আবার কখন প্রাণ বীতশোক আলোর সংরাগে
দেখেছে আকাশ হাসে, থোকা থোকা
স্থলপদ্ম ছায়া ফেলে জলে।

ছেঁড়া খোঁড়া মেঘ যায় আসে
আশ্বিনের প্রধান সুনীলে।

রথীন্দ্রনাথের জীবন

পিনাকী ভাদুড়ী

একজন মানুষের জীবন বৃথা গেল কি সার্থক হলো, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে জীবন সম্বন্ধে সেই মানুষেরই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে মেনে নেওয়া প্রয়োজন। যে মানুষ চায় ভালো রোজগার করে, বাড়ি বানিয়ে, টাকা জমিয়ে জীবন কাটাতে, তার সার্থকতা সেই দিক দিয়েই বিচার করতে হবে। আবার যে মনে করে জীবন মানে কোনো সৃষ্টিমূলক কাজ করা, কোনো বড়ো উদ্যোগে লিপ্ত হওয়া বা শিল্পকর্মে মেতে ওঠা, তাকে সেইভাবেই দেখতে হবে। কেউ যদি কিছুই হতে না চায়, শুধু বেঁচে থাকাটাই যথেষ্ট মনে করে, তাকেও তা'হলে সেইদিক দিয়ে দেখেই ভালো বা মন্দ, সফল বা বিফল বলতে হবে।

রথীন্দ্রনাথ যেহেতু রবীন্দ্রনাথের পুত্র শুধু ছিলেন না, ছিলেন তাঁর অন্যতম সহায়কও বটে, তাই সেই সুবাদে রথীন্দ্রনাথেরও জীবনে বিরাটত্বের ছোঁয়া লেগেছিল। তিনি যদিও প্রাথমিকভাবে তাঁর পিতাকেই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ক্রমশ তাঁর পিতা আর কেবল তাঁর পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইলেন না, তিনি ধীরে ধীরে এক বিশ্বমানবের অভিধায় বিবর্তিত হয়ে গেলেন। স্বভাবতই তখন রবীন্দ্রনাথের নাম—শুধু একজন ব্যক্তিকেই চিহ্নিত করছে না, ঐ নামটি তখন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রথীন্দ্রনাথ তখন তাঁর পিতার যে কাজ হাতে নিচ্ছেন, তার সম্ভাবনা হয়ে পড়ছে সীমাহীন, বিস্তৃতি হচ্ছে বিশ্বব্যাপ্ত, পৃথিবীর বহু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সেই সমস্ত প্রকল্প।

রথীন্দ্রনাথের জীবন তখন আর তাহলে আমার আপনার মতো দিনযাপন রইল না। তাঁর পিতাকে সাহায্য করার যোগ্য যেন তিনি হতে পারেন, বারে বারে নানা প্রসঙ্গে তিনি এই কামনার কথা জানিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে পিতৃ-সৌভাগ্যে তিনি ভাগ্যবান, তার যথোপযুক্ত মর্যাদা রাখবার জন্য তাঁকে যত্নবান হতে হবে। সেইদিকে লক্ষ রেখেই তিনি তাঁর জীবনকে চালনা করে গিয়েছেন।

সেক্ষেত্রে রথীন্দ্রনাথের জীবনের সার্থকতা এইদিক দিয়েই বিচার করতে হবে। তিনি যখন সাধারণ, গৃহস্থ জীবন কাটাতে চাননি অথবা নিজস্ব সৃষ্টিশীল কর্মের পরিবর্তে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর পিতাকে সুশৃঙ্খলভাবে দেশে-বিদেশে, বিশেষ করে ভবিষ্যতের জন্য উপস্থাপিত করে যেতে, আমাদের উচিত হবে সেই কাজটিরই সাফল্য বিশ্লেষণ করা এবং তা'হলেই রথীন্দ্রনাথের জীবনের সার্থকতা কি ছিল তার মূল্যায়ন করতে পারব। তবে সেই সঙ্গে আরো একটি কাজ আমাদের করতে হবে। রথীন্দ্রনাথ এই যে কাজটি তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবার মতো মানুষই ছিলেন কিনা সেটিও আমাদের বিচার্য বিষয় হতে পারে। রথীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবনের সায়াহ্নে এসে, তাঁর নিজের এই জীবনকর্ম অথবা কর্মজীবন সম্বন্ধে কী ভেবেছিলেন, সেটি যদি আমাদের নজর এড়িয়ে না যায়, তা'হলে তাঁর জীবনের সাফল্য কি বা কতদূর হয়েছিল, তাও আমরা অনুধাবন করতে পারব। ঘটনা-চক্রে রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পুত্র হিসেবে জন্মেছিলেন, এবং অল্পকালের মধ্যে তিনিই হলেন একমাত্র পুত্র যিনি স্বল্পায়ু না হয়ে জীবিত রইলেন। তাঁর দায়িত্ব বাড়ল অনেকখানি, পিতা তাঁর উপরে ভরসা করতে শুরু করলেন আরো বেশি করে। তিনিও পিতার ডাকে সাড়া দিলেন। তারপর থেকে তাঁর সারাজীবন কাটল ঐ কাজেই। যতদিন রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন, ততদিন তো বটেই, কবির মৃত্যুর পরেও রথীন্দ্রনাথের সে কাজ শেষ হয়নি। বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ নেই, রথীন্দ্রনাথের চিত্ত অশান্ত এবং কাণ্ডারিবিহীন, কিন্তু ছেড়ে যেতে পারেননি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত থাকতেও পারেননি।

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রথীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'শূন্য আশ্রমে ফিরে এসেছি। এখনো চিত্তকে সংযত করতে পারিনি।' কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লেখা এই চিঠিতে যে চিত্ত চাঞ্চল্যের কথা বলেছিলেন রথীন্দ্রনাথ, তা ছিল স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কিন্তু মনস্থির করে বিশ্বভারতীর কাজে লেগে গেলেও, তাঁর চিত্ত কতটা সংযত হতে পেরেছিল বা আদৌ হয়েছিল কিনা তা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। পিতার মৃত্যুজনিত দুঃখে চিত্তের যে সংযমহীনতা, তার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময়ের চিত্তবিক্ষিপ্ততা সব অর্থেই ভিন্ন। রথীন্দ্রনাথের বয়স আজ একশো পেরিয়ে গিয়েছে, সে বয়স তাঁর মৃত্যুহীন জীবনের, কিন্তু তাঁর দৈহিক জীবনও সামান্য ছিল না, তারও আয়ু সত্তর বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই পার্থিব

আয়ু কিভাবে তিনি ব্যয় করেছিলেন, কি ছিল তাঁর লক্ষ্য, এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করতে পারলে তাঁর জীবনের সাফল্য বা অসাফল্য যা ছিল তা আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে।

কিন্তু কেন এই কাজ আমরা করতে বসব? রথীন্দ্রনাথ কি এত বড়ো মানুষ ছিলেন যাঁর জীবনের সার্থকতা আমরা পরিমাপ করতে চাইব? রথীন্দ্রনাথ কত বড়ো মানুষ ছিলেন বা বড়ো মাপের মানুষ বলতে তাঁকে আদৌ গণ্য করা যায় কিনা, সে তর্কে যাবার প্রয়োজন নেই। আমরা দেখেছি অল্প কিছু মৌলিক রচনা ছাড়া রথীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর পিতার মতো কোনো সৃষ্টিকার্যে নামেননি, অথচ রবীন্দ্রনাথের কর্মযজ্ঞে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। একদিকে তিনি আমাদেরই মতো মানুষ, অন্যদিকে আমাদের মতো গতানুগতিক জীবন তিনি কাটাননি। এই দুয়ের টানা পোড়েনে তাঁর জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কি শিখতে পারি, সেইটি হবে আমাদের আলোচনার বিষয়।

রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন যে তিনি তাঁর পিতার প্রভাবে এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কেউ দেখতে পায়নি। তাঁর নিজস্ব শৈলী বা প্রবণতা যা ছিল তা কখনোই প্রকাশিত হতে পারেনি। একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জগতের অফুরান কর্ম রথীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহায়তার অপেক্ষাতেই ছিল। তিনি না হলে কবির অনেক স্বপ্ন হয়তো ভঙ্গ হতো। কিন্তু এও সত্য যে রথীন্দ্রনাথ যদি তাঁর নিজের মতো করে বাঁচতে পেতেন, তাহলে তাঁর ব্যক্তিগত স্ফুরণের জগৎ খুলে যেতে পারত। রথীন্দ্রনাথ তা চাননি। সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু বলার থাকে না। কারণ মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য বেছে নিতে পারে। রথীন্দ্রনাথও তাই নিয়েছিলেন। তাঁর পিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথও পুত্রের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই নিয়তি রথীন্দ্রনাথের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল কি? এ প্রশ্নের উত্তর পিতা বা পুত্র কেউ দেননি। এ ধরনের কথা তাঁরা কেউ ভেবেছিলেন বলেও মনে হয় না, কিন্তু সময় ও স্থানের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত না হয়ে পারে না।

কেউ বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের পুত্র হয়ে জন্মানো রথীন্দ্রনাথের পক্ষে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য দুটোই হয়েছিল বলতে হবে। কথাটার মানে বোঝা কঠিন নয়। পিতৃগৌরব লাভ করা রথীন্দ্রনাথের যেমন সৌভাগ্য, তেমনি কেবল পিতার নির্দেশে বা সেই উপলক্ষেই চালিত হওয়াটা দুর্ভাগ্যের হয়েছিল বলতে হবে।

রথীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কাজ সম্পর্কে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো মন্তব্য করেছেন। সেগুলি থেকেও আমরা বিষয়টা বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। পিতার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ দেশে-বিদেশে ঘুরেছেন। সেইসব ঘুরে বেড়ানোর কথা বলতে রথীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের ঘন ঘন মত পরিবর্তনের ফলে তাঁকে কতবার ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। যেমন, একবার নরওয়ে বেড়াবার জন্য জাহাজের টিকিট কেটে আনলেন রথীন্দ্রনাথ। জাহাজ কোম্পানী বলে দিল, এবারে কিন্তু টিকিট বদল হবে না। সব গোছগাছ করা যখন হয়ে গেছে, তখন ইংলণ্ডের সাউথ কেনসিংটনের ফ্ল্যাটে বসে রবীন্দ্রনাথ বললেন, সমস্ত কার্যসূচি বদলে পরের দিন সকালবেলাই প্যারিস যাত্রার ব্যবস্থা করা হোক। রথীন্দ্রনাথ ঘটনাটি কৌতুকের সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন। টিকিটের টাকা ফেরত পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু টমাস কুকের নির্ভরযোগ্য খদ্দের হিসেবে তাঁর খ্যাতি অনেকখানি খর্ব হয়ে গেল। এ বিষয়ে কবি তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথের সমগোত্রীয় বলে নিজেকে দাবি করতেন। দ্বারকানাথ সম্পর্কে চলতি ধারণা ছিল যে Babu changes his mind, কবিও তাই ছিলেন। এসবের ভোগান্তি অবশ্য পোহাতে হতো অন্য কাউকে, এক্ষেত্রে যেমন রথীন্দ্রনাথ ভুগেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় দেখছি যে বিশ্বভারতীর আর্থিক দিকটার উদ্বেগ রথীন্দ্রনাথকেই প্রধানত ভোগ করতে হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ বলতেন—"বাবা তো দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন। তাঁরাও একে একে আসতে লাগলেন। এলেন সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিজ, লেসনি; এলেন ফর্মিকি, তুচ্চি, কলিন্স, বেনোয়া, বোগদানভ, স্টেন কনো। এঁদের আসা-যাওয়া, থাকার ব্যবস্থা করতে সে-দুর্দিনে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে। দুশ্চিন্তায় ভুগেছি, আবার আনন্দও পেয়েছি—।" এই প্রসঙ্গেই আর একটি তথ্য উল্লেখ করা যায়। বিশ্বভারতীর অর্থের প্রয়োজনে কবি তাঁর সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব ১৯২৩-এ বিশ্বভারতীকে দান করেন। সেইসব রয়ালটি দিয়েই বিশ্বভারতীর তখনকার মতো আর্থিক সংস্থান হয়েছিল। পিতার গ্রন্থস্বত্বের উপরে পুত্রের অধিকার স্বাভাবিক, কিন্তু পুত্র বা পুত্রবধূ এ ব্যাপারে আপত্তি করেননি। এর আগেও কবি তাঁর নোবেল প্রাইজের টাকা গ্রাম্য কো-অপারেটিভে রেখেছিলেন। অনেকে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু তাঁর পুত্রের দিক থেকে কোনো বাধা আসেনি। রথীন্দ্রনাথ এদিক থেকে মহানুভব এবং পিতার কর্মের প্রতি তাঁর মনকে উৎসর্গ করার ব্যাপারটা বোঝা যায়। তবে মনে হয় রথীন্দ্রনাথের যদি আপত্তি করার ইচ্ছে হতো, তা হয়তো

টিঁকত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রকে সেই স্বাধীনতার সুযোগ দিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় জাগে যখন অমিতা ঠাকুরের জবানবন্দিতে দেখি—"একটা কথা মনে হয় ঠিক, স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছেলে বউকে দেননি।" কবি তাঁর পুত্রকে সবসময়ে তাঁর ভাবনার শরিক করতেন না। অমিতা ঠাকুরই জানাচ্ছেন—"গুরুদেবের মুখেই শুনেছি, একবার বিলেত যাচ্ছেন, টাকার খুব টানাটানি, তাই উনি জাহাজে প্রায় কিছুই খেতেন না···জাহাজের ডিনার, লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট সব বাদ। পরে শুনলেন যে খরচ তো পুরো দিতেই হয়েছে টিকিট করার সময়; তার পরে যা উনি মেন্থর বাইরে খেয়েছেন, (একটু টোস্ট) অতি সামান্য হলেও তার জন্য special charge বেশ লেগেছে। অথচ যদি একটু আভাসেও রথীন্দ্রনাথকে জানাতেন তা হলেই না খেয়ে টাকা গুনতে হতো না।"

এইরকম মানুষকে নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘোরার ঝক্কি যে কত তা পুত্র বুঝে-ছিলেন। কোথাও বা ট্রেন থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিচ্ছেন পুত্র, কবি তাঁকে কিছু না বলেই যাঁরা তাঁকে নিতে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে চলে গেছেন। পুত্র ঐ বিদেশ-বিভুঁয়ে বুঝতেই পারছেন না কবি কোথায় গেলেন। রথীন্দ্রনাথ এমনও বলেছেন—"বাবার যদি আর একটি ছেলে থাকত তো সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতাম।" অমিতা ঠাকুর বলেছেন যে রথীন্দ্রনাথ পারতপক্ষে বাবার কাছে ঘেঁষতেন না। প্রতিমা দেবী বা সুরেন করকে ঠেলে দিতেন কিছু বলবার থাকলে।

কবি অবশ্য তাঁর পুত্রের এই ত্যাগটিকে লক্ষ করেছিলেন। খুশিও হয়েছিলেন। কারণ এর ফলে কবির কাজ কবির ইচ্ছেমত অনেকদূর চলতে পেরেছিল। পুত্রের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে পুত্রের ত্যাগের শক্তিকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি—

মধ্যপথে জীবনের মধ্যদিনে
উত্তরিলে আজি; এই পথ নিয়েছিলে চিনে,
সাড়া পেয়েছিলে তব প্রাণে—
দূরগামী দুর্গমের স্পর্ধিত আহ্বানে
ছিল যবে প্রথম যৌবন।
সেদিন ভোজের পাত্রে রাখনি ভোগের আয়োজন
ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।···

তপস্যার ফল তব প্রতিদিন ছিলে সমর্পিতে
আমারি খ্যাতিতে।
তোমার সকল চিত্তে,
সব বিত্তে
ভবিষ্যের অভিমুখে পথ দিতেছিলে মেলে
তার লাগি যশ নাই পেলে।
কর্মের যেথানে উচ্চদাম
সেথানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে একপাশে।…
বিদায় প্রহরে রবি দিনান্তের অন্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র-'পরে।

কবির কর্মের দামটা উচ্চ, সেখানে পুত্রের নাম নেপথ্যে চলে যেতেই পারে, এহেন ত্যাগের ক্ষেত্রকে কবি আশীর্বাদ করছেন।

কিন্তু কবি তাঁর পুত্রের নিজস্ব ইচ্ছার কথা কি ভেবেছিলেন? প্রাথমিকভাবে তিনি রথীন্দ্রনাথকে সম্ভবত স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর রক্ষা করা যায়নি। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর দাবি এমনই প্রবল হলো যে রথীন্দ্রনাথকে সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্বভারতীর কাজেই নামতে হয়েছিল।

রথীন্দ্রনাথকে কবি বিদেশে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা শিখতে। রথীন্দ্রনাথ সে শিক্ষা যত্ন করে নিচ্ছিলেন। এদেশে ফিরে এসে ঐ কাজই করবেন এরকমই স্থির ছিল। সে প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন—'এসে দেখি শিলাইদহের কুঠিবাড়ি আমার জন্য প্রস্তুত—জমিদারির কাজকর্ম তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার খেত খামার গড়ে তুলব, কৃষি নিয়ে পরীক্ষা গবেষণা করব…যুবা বয়স, কাজ করার জন্য হাত মন নিশপিশ করছে—সুতরাং এর চেয়ে বেশি কি চাই।'

তখন পিতাপুত্রে রোজ সন্ধ্যায় আলাপ-আলোচনা চলত। এমন মন খুলে আগে কখনো কথাবার্তা বলেননি তাঁরা। পুত্রের মনে হতো তাঁর কেতাবি মতামত শুনে পিতা নিশ্চয় কৌতুক অনুভব করছেন। কবি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন না, বোধহয় ভাবতেন বিজ্ঞানের ছেলে সাহিত্যে রস পাবে না। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, '১৯১০ সালের সেই সময়টাতে আমরা পিতাপুত্র পরস্পরের যত কাছাকাছি এসেছিলাম তেমন আর কখনো ঘটেনি।' শুনে

আশ্চর্য হতে হয়। ১৯১০ থেকে ১৯৪১, এই সুদীর্ঘ সময় তখনো বাকি। আরো বড়ো কাজে দুজনে জড়িয়ে পড়বেন, তবু আরো কাছাকাছি আসবেন না, এই তথ্যটা অবাক করারই মতো।

রথীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে এসেছেন, তখন কবি তাঁকে লিখেছিলেন—'…স্বাতন্ত্র্য সকলেরই আছে…সমস্তই সুখে দুঃখে কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার ভিতর দিয়ে নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে…আমার জীবনের ক্ষেত্র অন্যত্র—সে ক্ষেত্র আমিই গড়েছি এখনো আমাকেই গড়তে হবে…তোদের এই সৃষ্টিকার্যের মধ্যে আর কারো হস্তক্ষেপ ভাল নয়—ও জায়গায় কোনো লোকেরই অধিকার নেই। তুই শিক্ষিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত—তোর কর্মক্ষেত্রও হাতের কাছে প্রস্তুত, উদ্যমের সঙ্গে নূতন নূতন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে কর্মকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবার বয়সও তোর। এই সমস্ত কথা চিন্তা করেই তোদের নিজেদের হাতেই তোদের সমস্ত ছেড়ে দিয়ে আমি ছুটি নিয়েছি…বাইরে থেকে তোদের উপর আমার নিজের ইচ্ছাকে কোনো আকারে চাপাতে চাইনে…আমার দিকে কিছুমাত্র তাকাবিনে—তোর নিজের জগৎ তুই নিজে সৃষ্টি করবি…এতেই তোর মঙ্গল।'

রথীন্দ্রনাথও খুব উৎসাহের সঙ্গে শিলাইদহে কাজে নেমে পড়েছিলেন—'শিলাইদহে আমার নূতন জীবন সুরু হল…অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেত তৈরি হল, আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে এল ভুট্টার বীজ ও…নানাবিধ ঘাসের বীজ। এদেশের উপযোগী করে নানারকম…যন্ত্রপাতি তৈরি করা হল—এমন কি…ছোটোখাটো একটি গবেষণাগারের পত্তন হল। …আমেরিকা থেকে এসেছিলেন মাইরন ফেল্পস…বলেছিলেন শিলাইদহে আমি নাকি একটি সত্যিকারের ভালো আমেরিকান ফার্ম গড়ে তুলতে পেরেছি।'

আরম্ভটা ভালোই হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটা বছর কাটানর পরেই এই অনাবিল আনন্দে ছেদ পড়ল। কবির পক্ষে আর পুত্রকে কেবল তার নিজের জগৎ নিয়ে থাকতে দেওয়া সম্ভব হল না। বোধহয় খানিকটা অসহায়ভাবেই তিনি পুত্রকে ডেকে পাঠালেন বিশ্বভারতীর কাজে। রথীন্দ্রনাথ গেলেন এবং তাঁর খেদ রয়ে গেল তাঁর রচনায়—'সেই শিলাইদহ, যার কুঠিবাড়ির চারদিকে গোলাপ ফুলের বাগিচা, একটু দূরে সুদূরবিস্তারী ক্ষেত, যা বর্ষার দিনে কচি ধানে সবুজ, শীতকালে সরষে ফুলের হলদে রঙে সোনালি; সেই পদ্মা নদী… এইসব যা কিছু আমার ভাল লাগত—সেইসব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হল বীরভূমের উষর কঠিন লাল মাটির প্রান্তরে।'

যা তাঁর ভাল লাগত, সে-সব ছেড়ে তিনি চলে গেলেন কঠিন জীবনে। আর তাঁর ফিরে আসা হয়নি। অমিতা ঠাকুরও ভেবেছেন—'পল্লীসংগঠন কাজে কেন জমিদারিতে তাঁকে বসালেন না।' রবীন্দ্রনাথের নিজেরও নিশ্চয় পুত্রকে টেনে আনতে ভালো লাগেনি, কিন্তু তাঁর বোধহয় উপায় ছিল না। পরবর্তীকালে আবার পুত্রকে তাঁর কাজে ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ হয় আর ঘটেনি, নয় ভাবার অবকাশও মেলেনি।

রথীন্দ্রনাথের জীবনে এই নিজস্ব কাজে বাঁধা আরো এসেছে। ১৯১২ সালে কবি যখন য়ুরোপ আমেরিকায় লম্বা সফরে গিয়েছিলেন, তখন ঠিক হয়েছিল যে রথীন্দ্রনাথ তাঁর পুরোনো শিক্ষালয় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করবেন। সেইরকমই চলছিল, রথীন্দ্রনাথ বেশ জমিয়ে পড়াশুনো করছেন, কবি চাইছেন তাঁর পুত্র শান্তিনিকেতনে রিসার্চ নিয়ে থাকবেন।

কিন্তু সব বদল হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ আর আমেরিকায় থাকতে চাইছেন না—হার্ভাডের বক্তৃতা শেষ করার আগেই কবি নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে গেলেন শিকাগোয়, আবার এলেন আর্বানায়, কিন্তু ইংলণ্ডে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন। রথীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে লিখেছেন এর উপসংহারটুকু—'বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের আর্বানার পাট এবার উঠিয়ে দিতে হবে—ডক্টরেট পাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই। এজন্য খুব যে আক্ষেপ হয়েছিল তা অবশ্য বলতে পারিনে।' আক্ষেপ হয়নি বলে নিজেকেই স্তোক দিচ্ছেন রথীন্দ্রনাথ, ওই 'খুব যে' শব্দ দুটিতেই সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু কবির এই আচরণের সদুত্তর পাওয়া যায় না।

রথীন্দ্রনাথ এ-সব ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ কোনোদিন করেননি। তিনি বিশেষ স্বাধীনতা পাননি, তাছাড়া নিজেকে নিয়ে তিনি কুণ্ঠিত থাকতেন। দূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রথিদা আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তিনি চিরকাল inferiority Complex-এ ভুগছেন।' রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি'তেও লিখেছেন—'বাড়ির মধ্যে আমারই রঙ কালো, চেহারায় বুদ্ধির পরিচয় ছিল না, স্বভাব অত্যন্ত কুনো, শরীর দুর্বল। মনস্তত্ত্বে যাকে বলে হীনম্মন্যতা, তা যেন ছেলেবেলা থেকে আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বড় হয়েও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি বলতে পারি না।'

এইজন্যই বোধহয় রথীন্দ্রনাথ যখন বাবাকে চিঠি লিখছেন, তাকে সম্বোধনে লিখছেন 'শ্রীচরণেষু', 'বাবা' লিখছেন না, অন্তত '৩৯ সালের চিঠিতে তাই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও যখন পুত্রকে চিঠি লিখছেন তখন কখনো ইতি টেনেছেন

'বাবা' লিখে, কিন্তু অনেক চিঠিতেই স্বাক্ষর করছেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'—ছেলেকে লিখতে বসেও তাঁর ইমেজ বা ইগো বোধহয় অজান্তেই কাজ করে গিয়েছে।

রথীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর কাজে জড়িয়ে পড়তে হ'ল। এই কাজের দায় এবং দায়িত্ব তাঁর নিজের পথে ছিল না। জীবনের তাগিদে অনেককেই অন্য পথে চলতে হয়। রথীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে তাগিদ ছিল তাঁর পিতার। রথীন্দ্রনাথ এই ঝঞ্ঝাট বহন করেছিলেন হাসিমুখে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সুখ পাননি। সে কথা ক্রমশ জানব আমরা। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতা মনে পড়ে—

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সবচেয়ে করেছে বিক্ষত।

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় পুত্রের উপরে অত্যাচার করতে চাননি, তবুও তাঁর পুত্রকে বিক্ষত হতে হয়েছে।

তৎসত্ত্বেও, রথীন্দ্রনাথ পিতার কাজকে শিরোধার্য করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পিতাকে তিনি প্রচার এবং রক্ষা করবেন, এটাই ঠিক করে নিয়েছিলেন তিনি। যেন এটাই তাঁর কৃত্য, 'বাড়ির মধ্যে' তাঁরই যেসব ঘাটতি ছিল, যার জন্য 'হীনম্মন্যতা' ছিল তাঁর, এইভাবে সেসব পূরণের জন্য লেগে পড়লেন রথীন্দ্রনাথ। তরুণ বয়সে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—তখন তাঁর মা চলে গিয়েছেন, শমীও নেই—'বাবাকে যত দেখছি, ততই কষ্ট হচ্ছে—স্পষ্টই দেখছি তাঁর মনে আর কোনও সুখ নেই। ···আমি তাঁকে সুখী করতে পারব এ বিশ্বাস আমার নেই। এখন থেকে নিজেকে যদি একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে পারি তা হলেই যা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারব একটু।'

এই 'কাজের মানুষ' হতে গিয়েই রথীন্দ্রনাথ তাঁর শখ, আহ্লাদ এবং ক্ষমতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। শিলাইদহ তাঁর যা 'ভালো লাগত', তা ছেড়ে আসার কথা আগেই বলেছি। কালীমোহন ঘোষ একটি ঘটনার কথা বলেছেন, যেটি উল্লেখযোগ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একবার রথীন্দ্রনাথকে লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির সভ্য হতে বলেছিলেন। রাজশাহী ডিভিশন থেকে যাতে রথীন্দ্রনাথ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারেন, সে ব্যবস্থাও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু রথীন্দ্রনাথ রাজি হননি। কারণ বিশ্বভারতী ছাড়া অন্য কাজে তিনি নামতে চাননি।

এ ছাড়া, রথীন্দ্রনাথের নিজস্ব কয়েকটি গুণ ছিল। তিনি খুব ভালো দারুশিল্পী

ছিলেন। কাঠের কাজে তাঁর সৃষ্টিশীলতা ছিল—পিতার ঐ বিশাল কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি কাঠ নিয়ে কাজ করেই সুখ পেতেন। বিশ্বভারতীতে তাঁর ১৬৭টি দারুশিল্প সংগ্রহ করা আছে। এইসঙ্গে আছে তাঁর চর্মশিল্পের কাজ। এইসব কাজের বিশ্লেষণ যোগ্য ব্যক্তিরা করেছেন, আমরা কেবল এ কাজে তাঁর আনন্দের কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাই। এইসব কাজ নিয়ে তিনি বলতেন—"জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।" রথীন্দ্রনাথ ভালো ছবিও আঁকতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"ফুলের ছবিতে ছেলের কাছে হার মানতে হল।" পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন—"কোনো ক্ষেত্রে তিনি নিজের স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে কখনো ব্যগ্র হননি। নয়তো তাঁর পিতার কীর্তির কাছে নিষ্প্রভ হলেও, সে স্বাক্ষর সম্পূর্ণই জলের লিখন নাও হতে পারত।" এল্‌মহার্স্ট বলে গেছেন—"তাঁর স্টুডিয়ো, তাঁর ছোটো কারখানাঘর, বা তাঁর উদ্যানচর্চার কাজে দেবার মতো সময় তিনি সামান্যই পেয়েছেন।" রথীন্দ্রনাথ ভালো লিখতেও পারতেন। এল্‌মহার্স্ট তাঁর লেখার মধ্যে ইংরেজিতে লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা পাবার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে যে রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র ক্ষমতা'র পূর্ণ ব্যবহারের সময় পাননি।

রথীন্দ্রনাথ আর্কিটেক্ট হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। তাঁর এবং সুরেন কর পরিকল্পিত 'উত্তরায়ণ' একটি creation—কালিম্পঙ-এর বাড়ি এবং শান্তিনিকেতনের নানা গৃহ তিনি পরিকল্পনা করেছেন। মরিস গয়ার তাঁর কাজ দেখে বলেছেন—'There is thought in every corner', এ্যাণ্ড্রুজ বলতেন, 'Rathi is writing poetry in bricks and mortar'—রথীন্দ্রনাথের এই craftsmanship যেন আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। তাঁর এতসব ক্ষমতার কথা একটু একটু করে হারিয়ে গেল। কে, রথীন্দ্রনাথ? ও, রবীন্দ্রনাথের পুত্র—এইটুকু শুধু তাঁর পরিচয় হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বিশ্বভারতীর জন্য এত যে ত্যাগ করলেন রথীন্দ্রনাথ, সেই কাজটি তিনি কেমন করেছিলেন? সেখানে তার স্বীকৃতি কতটুকু? রবীন্দ্রনাথের পুত্র এবং তাঁর সহায় হওয়া সত্ত্বেও রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা বিশ্বভারতী করেনি। যে বিশ্বভারতীকে একসময়ে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বা-রথী বলে ঠাট্টা করেছে, সেখানেই রথীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হতে চলেছেন। শেষজীবনে দেরাদুনে থাকতেন রথীন্দ্রনাথ। সেখানে তাঁর যেসব জিনিস বা যেসব কাজ এখনো আছে,

সেগুলি শান্তিনিকেতনে এনে কেউ রাখেননি। আসলে বহুদিন আগেই বিশ্বভারতীতে রথীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। তাঁর নামে অনেক অভিযোগ আছে। দিনেন্দ্রনাথকে মহর্ষির ট্রাস্ট থেকে রবীন্দ্রনাথ মাসোহারা দিতেন। দিনেন্দ্রনাথ ভালোবেসে এখানে কাজ করতেন। গরমের সময়ে তিনি ঐ টাকায় পাহাড়ে চলে যেতেন, গরম সইতে পারতেন না। ১৯৩৫ সালে 'আয় হচ্ছে না' এই বলে রথীন্দ্রনাথের বিরোধিতায় ঐ মাসোহারা দেওয়া হয়নি। দিনেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রথিদের কিছু আটকাচ্ছে না, আমি গরম সইতে পারি না তাই প্রতি বছর পাহাড়ে যাই সেইটুকু পাব না যেতে! পরে রথীন্দ্রনাথ তাঁকে মাইনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এতে এবং রবিদাদার ঔদাসীন্যে তাঁর অপমান পূর্ণ হলো।

দেখা যাচ্ছে প্রশাসক হিসেবে রথীন্দ্রনাথ সুবিধে করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার পরে তিনিই হলেন প্রথম উপাচার্য। রথী হলেন সারথি। কিন্তু সে কাজ তাঁর পক্ষে সুখকর হয়নি। তিনি একবার বলেছিলেন, চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ—আমি তো কেবল দুখানিই দেখছি।

বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রভবনের প্রথম ধারণা করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। তিনি International Newspaper Clipping Service-এর গ্রাহক হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত উল্লেখের কর্তিকা আনাতে থাকেন। কবির চিঠিপত্রের কপি রাখার বন্দোবস্ত করেন। সকলের কাছ থেকে কবির চিঠি বা অনুরূপ কিছু সংগ্রহ শুরু করেন। কবির ব্যক্তিগত চিঠি সংরক্ষিত হয়। কবির মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিও রথীন্দ্রনাথ এজন্য দিয়ে দেন। তাঁর মতে বাবার কিছুই আড়াল করার নয়। এসবই দেশের প্রাপ্য। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার আলাদা আয়োজন না হলেও, এই কাজটিই তাঁর স্মারক হয়ে থাকবে, এই বলে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন অনেকে। কিন্তু এটি ভাবের ঘরে চুরি। রথীন্দ্রনাথের এই কাজের খবর যাঁরা জানেন, তাঁরা চলে গেলে পরবর্তী প্রজন্ম এসব কিছুই জানবে না, কারণ এসবের কোনো স্বীকৃতি রবীন্দ্রভবনে নেই।

১৯৫১-তে রথীন্দ্রনাথ উপাচার্য হন এবং ১৯৫৩-তে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান। এইটুকু সময়েই তিনি নানা বিরূপতার সম্মুখীন হন। তাঁর নামে জহরলাল নেহরুর কাছে গুপ্তপথে নানা অভিযোগ যেতে থাকে। জহরলাল এ-সবে উদ্বিগ্ন হয়ে রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন—I am rather worried about the state of affairs in Santiniketan. Reports are current that there has been a considerable deterioration in the standards of teaching and

discipline। তখনকার মতো রথীন্দ্রনাথের উত্তরে নেহরু আশ্বস্ত হলেও সঙ্কট কাটল না। রথীন্দ্রনাথের জন্য তদন্ত কমিটিও গঠিত হল। তাঁদের কাছে অভিযোগ ছিল যে নেশা করে বা জুয়া খেলে রথীন্দ্রনাথের একদল চাটুকার সব নষ্ট করে দিচ্ছেন।

রথীন্দ্রনাথ যেসব প্রস্তাব দিয়েছেন UGC তা গ্রহণ করেনি। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির রথীন্দ্রনাথের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি বলেছেন—I am most unhappy about the developments that have taken place in Viswa-Bharati... I am afraid almost all this trouble is due to Mr. Tagore... We found that the finances of Viswa-Bharati required careful examination and when it was proposed to send a visiting team from here, Mr. Tagore pleaded that he was not ready with his accounts... Mr. Tagore eventually resigned...। বোঝাই যাচ্ছে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এসেছিল। রথীন্দ্রনাথ শারীরিক কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করলেন।

দেরাদুনে চলে গেলেন তিনি। বিশ্বভারতী থেকে তাঁকে কোনো farewell দেওয়া হ'ল না। আরো আশ্চর্য, যেখান থেকে তাঁকে চলে যেতে হ'ল, তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী কিন্তু সেখানেই রয়ে গেলেন। রথীন্দ্রনাথ গেলেন একা। বা ঠিক একা নয়, তাঁর নির্জন দিনগুলোর সঙ্গিনী ছিলেন মীরা চট্টোপাধ্যায়—বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী। তাঁর স্বামী ছিলেন সেখানকার অধ্যাপক। এই বিষয়টি নিয়ে কেউ স্পষ্ট কথা বলেননি, শুধু গুঞ্জন করেছেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে এই মহিলার কাছে শান্তি পেয়েছিলেন কিনা তার কোনো সংবাদ কেউ রাখেনি। রথীন্দ্রনাথ এই সময়ে কোনো দিনপঞ্জী লিখেছিলেন কিনা তাও জানা যায়নি।

দেরাদুনে গিয়েও তিনি শান্তিনিকেতনের খবর চাইতেন। পেতেন না। বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্যকে ১০ নভেম্বর ১৯৫৪-তে লিখছেন—"শান্তিনিকেতনের কোন খবরই পাই না, আমাকে সকলে ভুলে গেছে।" আর একটি চিঠিতে লিখছেন, শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে একটা চিঠি লিখেছেন। ...আমি সত্যি মিথ্যে কিছুই জানি না—পূর্বে কর্মসমিতির Proceedings পেতুম, এখন তাও পাই না, জানব কি করে। সেইজন্যে শাস্ত্রীমহাশয়ের চিঠির জবাব দিতে পারছি না।"

অমিতা ঠাকুর লিখেছেন—"বোধহয় সারা জীবন একটা চাপের মধ্যে থেকে

শেষটা স্বাধীনভাবে জীবন কাটাবার ইচ্ছে হল, তাই বিশ্বভারতী ছেড়ে চলে গেলেন দেরাদুনে। সেখানে পূর্ব পরিধান জোব্বা ইত্যাদি ফেলে শার্ট, শর্টস পরে বয়সও যেন অনেকটা কম দেখাতে লাগল। শরীরও ভালো হয়ে গেল।" দেরাদুন চলে যাবার ব্যাপারটা এতে সরল করে দেখাবার চেষ্টা আছে, তবে লক্ষ করার মতো যে রথীন্দ্রনাথ তাঁর পোশাক পর্যন্ত পাল্টে ফেলে life style নতুন করে নিলেন। চলে যাবার আগে তিনি বলেছিলেন—"এতদিন কাজ করেছি, জীবনযাপন করিনি।"

বড় নিদারুণ এই স্বীকারোক্তি। যিনি সারাজীবন দিয়েছেন একটা কাজে, জীবন সারা হবার সময়ে তিনি কি বলছেন? যিনি তাঁর কাজের মধ্যে ভারতের স্বরূপ খুঁজছেন, বলছেন, "Science বা Technical Training হোক বা না হোক কিছু যায় আসে না—ওর সময় আছে···শান্তিনিকেতনকে ভারতের culture-এর কেন্দ্র করে তুলতে হবে"—অথবা যিনি বলেছেন, 'বাবার personality ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখবার নয়—সব materials national property হওয়া উচিত", তাঁকে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে বিশ্বভারতী কোনো আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানায়নি। চোখের জল ফেলে তিনি ফিরে গিয়েছেন দেরাদুনে। সেখানে একা চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্র পরিষদ গড়বার। স্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছেন সেসব কথা ১৯৬১-র ১৯ মে; ৩ জুন তাঁর সময় হয়ে গেল, তিনি চলে গেলেন। বিশ্বভারতীতে তখন প্রথমে কিছু করা হয়নি। পরে কয়েকজন বলায় একটি শোক-সভা হয়েছিল। তাঁর শতবার্ষিকীতে কোনো নতুন মূল্যায়ন হয়নি। শুধু কয়েকটি পুরোনো রচনা একত্র করে একটি সংকলন বার করে দায় সেরেছেন বিশ্বভারতী।

অনেক প্রতিভাধরের জীবনেও বিপর্যয় আসে। মাইকেলের জীবনাবসান হয়েছিল দাতব্য চিকিৎসালয়ে, শিশিরকুমার মঞ্চ হারিয়ে 'ভাড়াটে কেষ্ট' সেজে শেষজীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু এঁরা কেউই এঁদের মহিমা থেকে চ্যুত হননি। রথীন্দ্রনাথ অবশ্য এঁদের মতো কীর্তিমান নন। তবু তাঁরও কম-বেশি সৃষ্টির জগৎ ছিল। সেইটি অনুসরণ করার সুযোগ পেলে অর্থাৎ তাঁর স্বধর্ম পালন করতে পেলে তাঁকে বোধহয় তাঁর জীবিতাবস্থাতেই স্বীকৃতিহীন হয়ে যেতে হতো না।

তথ্যসূত্র:

পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র (২য়)—রবীন্দ্রনাথ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর – জন্মশত বর্ষপূর্তি শ্রদ্ধার্ঘ্য (বিশ্বভারতী)
দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থ – (টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট)
রথীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী – বীতিহোত্র রায় (প্রৈতি, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, Nov. 1988)

একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ
"উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ" – পিনাকী ভাদুড়ী

[বঙ্কিমচন্দ্রকে যে অর্থে সাহিত্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনার দায়িত্বও নিতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে সমালোচনায় নামেননি। বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যের আদর্শ তৈরি করে দিতে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন বাংলাভাষার নবজন্ম। অবশ্য, কবিকেও তাঁর পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে সাহিত্য আলোচনা করতে হয়েছে, নানাপ্রসঙ্গে নানাপ্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কথাটিও তিনি ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই সমসাময়িক এবং উত্তরকালের সাহিত্যিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে তিনি নিয়মিত না হলেও, নানা মন্তব্য করেছেন, মতামত দিয়েছেন।

উত্তরকালের সাহিত্যপ্রসঙ্গে তাঁর মূল্যায়ন নিয়ে পিনাকী ভাদুড়ী লিখেছেন 'উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ'। বিষয়টি নিঃসন্দেহে আকর্ষক, এ পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো ধারাবাহিক বিধিসম্মত বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়নি। লেখক বিস্তারিতভাবেই আলোচনাটি করতে চেয়েছেন, যদিও বলেছেন যে সবই যে বলা গেছে এমন নয়। তা হতেই পারে, বিষয়টি এমন, যা বারে বারে গবেষণার যোগ্য এবং যার তথ্য ক্রমশ বেড়ে যেতেই পারে। পিনাকীবাবু প্রাথমিকভাবে যে সম্ভার যোগাড় করেছেন, দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, তা প্রচুর।

২৮ জন সাহিত্যিক সম্বন্ধে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রমন্তব্য সংকলিত এবং বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত এর বিস্তার। রবীন্দ্র-অনুসারী যেমন আছেন, তেমনি আছেন রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হবার চেষ্টায় রত সাহিত্যিক। লেখক প্রত্যেককে তাঁদের দিক থেকে দেখিয়েছেন। প্রাচীন করুণানিধান কালিদাস থেকে সত্যেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র, রাজশেখর হয়ে তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, সমর সেন – কেউই বাদ যাননি।

এছাড়া, অনেকের সম্বন্ধে কবির সংক্ষিপ্ত মতামত আছে। সেইরকম কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশজনের কথা লেখক বলেছেন কবির ইতস্তত ছড়ানো মন্তব্যের যে অধ্যায়টি আছে, তার মধ্যে। 'একটি চিঠি, দুটি দৃষ্টিকোণ' অধ্যায়ে তনানীন্তন শনিবারের চিঠি বনাম কল্লোলকালিকলম গোষ্ঠীর যে বিবাদ, তার পরিচয় এবং সেখানে কবির ভূমিকা কি ছিল, তা বিশদভাবে বলেছেন লেখক। রবীন্দ্র-সম্পাদিত কাব্যসংকলনের ব্যর্থতা এবং তাঁর পরিত্যক্ত গল্পসংকলনের কথা একটি পৃথক অধ্যায়ে নানা দিক থেকে আলোচিত হয়েছে। বইটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এতে যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধারণার দৃঢ়মূল ভিত্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন লেখক, তেমনি তাঁর দোলায়মান স্ববিরোধিতাও লেখক দেখিয়ে দিতে ছাড়েননি। বইটির সুদীর্ঘ মুখবন্ধটি খুবই উপভোগ্য। বইটি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশ করেছেন, দাম ৬৫·০০ বিভাব সম্পাদক।]

কবিরুল ইসলামের কবিতা

মল্লিনাথ গুপ্ত

কবিরুল ইসলাম পঞ্চাশ দশকের এক প্রধান কবিনাম। যে উচ্চকিত শব্দসঞ্চার, রমণীপিপাসু যে ছন্দ-প্রকরণযাত্রা একজন কবিকে অতি সহজেই সাধারণ পাঠকের নজরে আনে, শুরু থেকেই তা থেকে তিনি দূরে থেকেছেন। তাঁর কাব্যকণ্ঠ এতই মৃদু, স্নিগ্ধ ও আত্মমগ্ন, যে খুব উৎকর্ণ ও মনস্ক পাঠক না হলে কবিরুলের কবিতার প্রকৃত তাৎপর্য পাঠকের কাছে আবিষ্কৃত নাও হতে পারে।

কি অজ্ঞাত কারণে জানি না, জানলেও বলা সহজ হতো না, কেন আজো তিনি তেমন আলোচিত কবি নন। অথচ সমস্ত মান্য সংকলনে ও বাংলা কবিতার সামগ্রিক আলোচনায় তার নাম ঘুরে ফিরেই আসে। যে কোনো বিচারনিরিখের কষ্টিপাথর কবির কবিতার স্বর্ণ অংশটুকু লুকিয়ে রাখতে পারে না। একমাত্র শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসন ছাড়া কবিরুলের কবিতার তেমন উল্লেখ্য আলোচনা কেউ করেননি। অথচ এ-ধরনের আলোচনা খুবই জরুরি ছিল।

আমরা যারা ঝরনার তীব্র শব্দময় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই, সমুদ্র কল্লোলের আদিগন্ত নীল-সচলতায় সম্মোহিত হই, সেই আমরাই কজন মনে রাখি ফল্গু নামক এক পুণ্যবান জলধারার কথা, বেশ কিছুটা বালি না খুঁড়লে যার দেখা কখনো পাবো না। কবিরুলের কবিতা ফল্গুর মতই শান্ত স্নিগ্ধ ও অন্তরসঞ্চারী। অথচ সরলতা ও সহজতাই তার কবিতার শেষ কথা নয়, একই সঙ্গে তা বহুকৌণিকও। এই কৌণিক ও মৌলিক বিচ্ছুরণ ধরতে গেলে তার কবিতাকে একাধিকবার পড়তেই হবে। স্বীকার করা ভালো কবিরুলের কাব্যপ্রকরণের পরিধী সীমিত। এমনকি সমসময়ের যে সব নানামাত্রিক সমস্যা কবির ভাষায় অন্তর্গত হয়ে তাকে যুগধারক বলে চিহ্নিত করে, কিছু বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া কবিরুল যুগসমস্যায় তেমন লিপ্ত হননি। অথচ তার কবিতা দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হয়েছে। "সবার মাঝে তিনি একেলা" থাকতে পারেন। "কেমন করে তার সারাটা বেলা" কাটে তাও আমাদের অলক্ষ্য থাকে না যখন আমরা কবির স্নিগ্ধ নিঃসঙ্গ পংক্তিগুলির সঙ্গী হই।

আলোচ্য কবিতাগুচ্ছে নতুন এক কবিরুলকে পাওয়া গেল, গোপন ফল্গু এবার অনেকটাই মাটির ওপরে উঠে এসেছে। হতে চাইছে জলস্বচ্ছল ধারায় প্রবাহিনী। এই স্ফুরণ যা প্রায় বিস্ফারেরই কাছাকাছি, আমাদের একই সঙ্গে বেদনাঘন আত্ম-বিশ্লেষণআর্ত এক নতুন কবিরুলের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

হাতে-খড়ি

এ-যাত্রা হলো না দেখা : এ-যাত্রা হলো না কিছু শেখা
শুধু নিরক্ষর অজ্ঞানতা থেকে
গ্রন্থের গ্রন্থনা থেকে
সাগ্রহ সংগ্রহগুলি অপঠিত থেকে গেল সবই
সাজানো-শোভন সঞ্চয়িতা থেকে
সূর্যাবর্ত—
আমার অন্ধতা ছাড়া আর কিছু নয়
রবির কিরণ কই, শঙ্খে সমুদ্রের সফলতা কই !

আমি অন্ধ-বধির তাই কিছুই হলো না :
ব্রেইল অক্ষরের বই কে দেবে আমাকে
কে দেবে আমার হাতে-খড়ি
কে দেবে আমার নাম লিখে বর্ণহীন ফ্লাই লিফে ॥

নিজস্ব অক্ষর

আমার ভিতরে নয়, যা আছে তা তোমারই ভেতরে
আমারই কারণে তুমি রৌদ্র মেলে দাও
এই দেওয়া ফুরাবে না, এই বিনিময়
ঊর্মিমালা দু'তীরের সংগোপনে তার
নিজস্ব অক্ষর লেখে বর্ণ পরিচয়ে

এই বর্ণবহুলতা বিশ্ববিজয়িনী ॥

বিষ্ণু দে স্মরণে

সূর্যাস্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখেছি আমি
পাখিদের উড়ে-যাওয়া দূর থেকে সন্নিকট দূরে
গাছেদের দীর্ঘ ছায়া লম্বালম্বি পড়েছে শস্যের খেতে
আলোছায়াময় উত্তীর্ণ উত্তরে—
মাঠে-মাঠে লাইট পোস্টে তারের ওপর বসে আছে
লেজ-ঝোলা সঙ্গীহীন নাম-না-জানা পাখি
শেওড়া গাছে পেত্নীর ভয়ের দিকে আমার যাত্রার শুরু
হে আমার প্রেমময়ী স্ত্রী, আজও তোমার ভয় কেন
এই অনতি বৃদ্ধকে ঘিরে,
বৃদ্ধের তারুণ্যে, না তার যৌবনে :

'অন্ধকারে আর রেখো না ভয়,
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ…'

হাড়

স্পর্শকাতর, তুমি কোন্‌দিকে যেতে চাও ?

যেদিকে সকলে যায়, অন্তত সেদিকে নয়
নতমুখ বৃত্ত দুটি যে-রকম প্রচ্ছন্ন-প্রচ্ছদে
উস্‌কে দেয় যাবতীয় লজ্জার শিকড়
শিথার আড়াল

সাতকাহন কথা নয়, যৎসামান্য কুশল সংলাপ
রঞ্জনরশ্মির মতো উপ্‌ড়ে আনে হৃদয়ের হাড়

স্পর্শকাতরতা, তুমি ঠিক কোন্ দিকে যাবে ?

আমি শুধু হাড় নয়, আমি চাই মন্ত্রোচ্চারণও—
যা হাড়ের মধ্যে ঢুকে বাজাবে ডুগডুগি ॥

বিগ্রহ

আমার পূজা শুধু শরৎকালে নয়
আমার পূজা প্রতিদিন
আমার বারো মাসে তেরো পার্বণ মাত্র নয়
প্রতিদিনই আমার পার্বণ

আমার তো কথিত কোনো বিগ্রহ নেই—
সাকারে নেই, না, নিরাকারেও নেই—
মানুষ আমার বিগ্রহ
মানুষী আমার দেব-প্রতিমা

তাই আমার ব্যক্তিগত বিগ্রহের কোনো
বিসর্জনও নেই :
ফলত, প্রতিদিন আমার পূজা
প্রতিদিনই আমার পার্বণ ॥

একদা

একদা ছিলো
সবুজ
নীল
এখন গৈরিকী

একদা ছিলো
তীর্থ
যাত্রা
এখন দৈনিকী

জীবন যুদ্ধে
পর্যুদস্ত
সকল সৈনিকই

তবুও আমরা
জীবনবাদী
বন্ধু, তৈরি কি ?

কিছু ছেঁড়া স্বপ্ন স্মৃতি

আমাদের দিন শেষ হয়ে এলো : নাতিদীর্ঘ পথের দুপাশে
রয়ে গেলো
কিছু ছেঁড়া স্বপ্ন-স্মৃতি
কিছু হাসি কিছু বা চোখের জল
কিছু ম্লান ভালোবাসা আর বিদায়ী সান্ত্বনা

কিছু ঋণ রয়ে গেলো, বাজারে ধারদেনা রয়ে গেলো
শোধ করে দেবো, ইচ্ছা ছিলো—
কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর সময় ছিলো না
ইচ্ছা ছিলো আমার পাথেয় কিছু রেখে যাবো
একা-একা তোমার পথচলা যেন আরেকটু সহজ হয়
সন্তানের জন্যে ছিলো স্নেহ-ভালোবাসা
স্ত্রীর জন্যে ছিলো প্রসাধনহীন প্রেম
ছিলো
কথা কাটাকাটি, ঝগড়া ঝাঁটি ছিলো, মন-খারাপ ছিলো
মতের অমিল, রুচির তফাৎ ছিলো
যাকে বলে বনিবনা তেমন কি ছিলো ?—
এতো অবাস্তব বিরুদ্ধতা কলকাতার চন্দ্রোদয়-মুহূর্তের মতো···

তবু সবই ছিলো, যে রকম থাকে মধ্যবিত্ত মানসে ও
জীবনযাপনে
না, সাধ্য ছিলো না ততো, যতো সাধ ছিলো

এ ভাবেই আমাদের হ্রস্বতম দিন, আমাদের দীর্ঘতম দিন
আনাচে-কানাচে
রয়ে গেলো

রয়ে গেলো, সদর রাস্তায়
রয়ে গেলো কিছু ছিন্ন স্বপ্ন ও স্মৃতির মগ্ন মালিকা
নাতিদীর্ঘ পথের দুপাশে রয়ে গেলো ॥

চিঠি

এসো, হাত ধরো
মুঠো খোলো, কি আছে ভেতরে আমাকে দেখাও
যে-চিঠি গোপনে তুমি পড়তে চাও একা-একা
জেনো, সে-চিঠি আমারও
তুমি কি জানো না ?

মুঠো খুলে দাও।
আর মেলে ধরো পাঁচটা আঙুল
চিঠির অক্ষরগুলি ফিরে যাক বর্ণ-পরিচয়ে

এসো, আমার এক হাত ধরো ॥

এক একর জমি

আমার বাড়ানো হাত যদি ইচ্ছে করে স্পর্শ করো,
একটু মোচড় দাও যেমন নিপুণ ডেন্টিস্ট দাঁত তোলে
তোমার সমগ্র চাই তোমার অতুল ডান হাতের চেটোতে
যা ছিল অতীত ভুল : কেউ বা ভোলে না, কেউ ভোলে !

না, কোনো জোয়ার নয়, আমি শুধু শুদ্ধিকরণ চাই
তোমার এক বয়সী : আরও একবার রক্তকণিকার দ্রোহে
আমি শেষ বুঝে নিতে চাই—যা আমার এক-একর জমি
আরও অল্প কিছুদিন মাত্র ইজারা ও চাষবাসের মোহে।

স্রোতের বিরুদ্ধে নয়, সোহাগিনী, শেষ সঞ্জীবন,
আমার দুহাত শূন্য পঞ্চাশ-পেরোনো, স্পর্শে পূর্ণ করো
তোমার আভূমি নত ক্লান্তি শিখা, আরও একটু উসকে দাও—
রুমালি বিদায়ে হাত নাড়ো, কিংবা ধরো, শক্ত করে ধরো।

আরও যৎসামান্য কিছুদিন আছে, লেখা হোক শেষের কবিতা :
তোমার নিজস্বে ন্যস্ত, অবিন্যস্ত লাবণ্যের অমিত বা মিতা ॥

অশোক মিত্রের জন্যে মিছিল

একদা যার কবিতা ছিলো আহার
আর নিঃশ্বাসের বায়ু
একদা যার কবিতা ছিলো জীবন
আর যৌবনের পরমায়ু, দোসর
একদা যার কবিতা ছিলো নিদ্রাহীন, নিদ্রাহরণ
রাতের পরে রাত
একদা যার কবিতা ছিলো জীবন
এবং
জীবন

এখনও সে কি তেমনি আছে
একটি শব্দে জ্যোৎস্না খুলে
ফুল্ল বিসংবাদও

একদা যার কবিতা ছিলো মধ্য রাতে
ট্র্যাম লাইনে হাঁটার পর হাঁটা
তিন বন্ধু লেকের পারে, ২০২-এ অট্টহাস্য
বৌদ্ধ অভিসার

এখনও সে কি তেমনি আছে। গৌরীময় ঐক্যে
বৈপরীত্যে
এখনও সেকি তেমনি মন্ত্রী মন্ত্রণার ছলে
জল দেখে জলে জড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে না॥

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
প্রিয়বরেষু

কি খবর, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ,
আমাদের কলকাতা কেমন লাগছে ?
এই এতো এতো দিন পর তুমি পুঁথির অক্ষর ফুঁড়ে যেন সশরীর
একা-একা উঠে এলে
অন্তত, আমার জন্যে আজ মুখোমুখি

একি স্বপ্ন, নাকি মায়া, কিংবা মতিভ্রম—
যেন গোরস্তানে দুই মুর্দা সফেদ লেবাসে পাশাপাশি
হেঁটে যাচ্ছে, হেঁটে যাচ্ছে, হেঁটে যাচ্ছে···
ঢাকা-কলকাতার মসলিন বুননে

এতো কাছে, তবু এতো দূর—
পাশপোর্ট ও ভিসা আপিসের জটিল জঙ্গলে ঘুরে
আমাদের পরস্পর পরিচয়পত্র তাই লটকে আছে নো-ম্যান্‌স্‌-ল্যাণ্ডের
শিশু গাছে॥

বিচ্ছিন্নতা ও মনোবিকলন : ফ্রয়েড হাবারমাস

পথিক বসু

১

বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলাদা কোনো গবেষণা করেননি ফ্রয়েড, এমনকি দু'চারটে কথাও বলেননি যার সাহায্যে বিচ্ছিন্নতার মতো গুরু বিষয়ের ওপর কিঞ্চিৎ আলো পাওয়া সম্ভব, ফ্রয়েডের অ্যাবস্ট্রাক্টেও পাওয়া যায়নি বিচ্ছিন্নতার indexing। কারণ একটাই : ফ্রয়েডীয় প্রকল্পে বিচ্ছিন্নতা কোনো মৌল ভূমিকা পালন করেনি।

কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আজকের যুগে যখন কাজ করতে বসি, যখন দেখি বিচ্ছিন্নতা একটা মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি-বিশেষ, তখন খুব স্বাভাবিক জানতে ইচ্ছে করে মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি ফ্রয়েড কিভাবে বিচার করতেন যার কোনো একটার (অথবা একাধিকের) সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার মিল থাকলেও থাকতে পারে। এই স্পষ্ট ধারণা নিয়ে ফ্রয়েড তত্ত্বে ঢোকার প্রয়োজন দেখি।

আলোচনায় এগোতে হলে তাই আমাদের বুঝে নিতে হবে বিচ্ছিন্নতা বলতে আমরা কি বুঝি। বিচ্ছিন্নতা সেই ট্রাজিক মুহূর্ত যেখানে মানুষ তার নিজের থেকে পৃথক ; মার্কসীয় মতবাদে যেটা মানুষ আর তার শ্রমের পৃথগন্নতা, হনি'র মনোদর্শনে যেটা প্রকৃত 'আমি'র সাথে বাহ্যিক 'আমি'র বিরুদ্ধতা। ফল একটাই : মানুষ তার নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে—আমি যদিও আমি, তবু আমি বুঝতে পারছি না কোনটা আমি অথবা কি আমি, অথবা কিসে আমার পরিচয় ? এবং এই আমি থেকে যখন 'আমিত্বটা' বিভাজিত হয়ে গেল, তখন আমার মধ্যে একধরনের মনোবিকলন জন্ম নেবে—যখনি আমি আমার অন্তর্জ চাহিদা-আশা-আকাঙ্ক্ষা না বুঝে শুধুমাত্র বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছু আচার-আচরণ করব, ঠিক তখনি আমার অন্তর আর বাইরের পার্থক্য টানা হয়ে যাবে, আর সেই পার্থক্য আঘাত হানবে আমার ওপর—আমি নিজেকে না বুঝে যদি কিছু আচরণ-অভ্যাস করি সেটা অস্বাভাবিকই হয়ে পড়বে। অর্থাৎ মানসিক বিকৃতি দেখা দেবে, অন্তর হয়ে পড়বে অস্বাভাবিক এবং যে কারণে এই দুর্ঘটনা, তার

নাম বিচ্ছিন্নতা-বোধ। সুতরাং ফ্রয়েডীয় প্রকল্পে বিচ্ছিন্নতা না থাকলেও মানসিক বিকৃতির যেসব কথাবার্তা বলা আছে সেটা টেনে আনা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে, কারণ বিকৃতি আর বিচ্ছিন্নতা তুল্যমূল্য : উভয়েই উভয়ের কার্যকারণ। অতএব ফ্রয়েডে সুস্থ সমর্পণ, বিচ্ছিন্নতা অধিকন্তু, এইমাত্র।

২

বিচ্ছিন্নতা-বোধের মনস্তাত্ত্বিক অর্থ হচ্ছে আত্মদূরত্ব। স্বাভাবিক আমি থেকে প্রকৃত 'আমি'কে লুকিয়ে রাখা কিংবা দূরত্ব বজায় রাখার মানে হ'ল 'আমি'র ভাল অংশকে চাপা দেয়া। যদি ধরে নিই আমার একটা অন্ত্যজ শপথ আছে, আমি তাকে ভালমত অনুভব করেছি এবং অনুভব করে আমি জগৎজীবনে সেই শপথকে প্রবাহিত করতে প্রতিজ্ঞ হয়েছি, তাহলে এই গোটা পদ্ধতিতে কোনো বিচ্ছিন্নতা দানা বাঁধবে না। আমার অন্তর ও বাইরের মধ্যেমের সু-সম্পর্ক, বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে তুলবে। কিন্তু বাস্তব দুনিয়া একেবারেই এরকম নয় বরং বিপরীত—বাস্তব সমাজের চাপে আমার মূল চাহিদা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে, বাঁচার তাগিদে অথবা ভয়ে বাস্তব দুনিয়া যেমন বলছে আমি তেমনি করতে বাধ্য হচ্ছি, বাধ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্ত্যজ শুভবুদ্ধিকে আমি চাপা দিতে সচেষ্ট হচ্ছি, সংজ্ঞানুসারে এ থেকেই গড়ে উঠছে বিচ্ছিন্নতা-বোধ। অন্যদিকে ফ্রয়েডীয় প্রকল্পে ইচ্ছার কবর দেয়ার মানে repression, অবদমন, ফলে রৈ রৈ করে অবদমন-নীতি নিয়ে ঢুকে পড়ার সুলভ সুযোগ পেলেন ফ্রয়েড।

ফ্রয়েডের মতে মানুষের মনে তিন ধরনের চেতনা কাজ করে—সচেতন অচেতন ও মগ্নচেতন। অন্যদিকে মনের কাজ করার ইচ্ছা নির্ধারিত হয় তিনটি স্তরমাত্রিক : ইদ, ইগো ও সুপারইগো। আমার আদি বাসনার নাম ইদ, সে বাসনা আমি অজ্ঞান বয়স থেকে রিফ্লেক্সের ছন্দে বার করে আনি, সেটা সহজ বাধাহীন ভাবে বেরিয়ে আসছে দেখে আমি কার্যকারণ না-জেনে-বুঝে তাদের প্রয়োগ করে থাকি ; যেহেতু সেটা সচেতনা-অনপেক্ষপদ্ধতি তাই তার নাম অচেতন। তেমনি কিছু কিছু ইচ্ছা আছে যাদের আমি সমাজ সংসার থেকে পেয়েছি, সমাজের শৃঙ্খলা রাখতে আমাকে বলা হয়েছে বাবা-মা-গুরুজনকে শ্রদ্ধা করতে, মুখে মুখে তর্ক না করতে—এইসব প্রবণতাও কিন্তু ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ ; আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা সায়েবসুবো লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম, খাওয়া মাত্র আমরা উভয়েই উভয়কে 'সরি' বলে পাশ

কাটাব, কিন্তু কেন 'সরি' বললাম ? এটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। লোকটা যদি চাষী মজুর হতো তাহলে কি 'সরি' বলতাম ? অর্থাৎ কিছু কিছু কাজ করি যা করতে হয় বলে করি, এদের আমরা moral taboos বলি। ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় ওরই নাম সুপারইগো আর এই বাসনা জমা থাকে মনের মগ্নচেতন অংশে অথবা বাসনা ক্রিয়াশীল হয় মগ্নচেতন চৈতন্যের দ্বারা। এছাড়া আরেক ধরনের ইচ্ছা থাকে যাদের আমরা সচেতনা দিয়ে বুঝি, আমাদের বিচার বিশ্লেষণ জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগ করে সেসব ইচ্ছার প্রকাশ করি। ওদের ইগো বলা হয় এবং ইগো তার সচেতন যাত্রার জন্যই মনের চেতন অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়।

এই প্রকল্পে এবার দেখা যাক ইচ্ছাদের অবদমন কিভাবে সংঘটিত হয়।

একটা ইচ্ছা আমার ভেতর থেকে উঠে এলো। হতে পারে সেটা ইদ ইগো বা সুপারইগো, এবং ধরে নিচ্ছি সমাজ সেটা মানল না। শুধু যে মানল না তাতেই শেষ নয়—ব্যাপারটা নিয়ে পরিহাস প্রহসন শুরু হ'ল। এতে আমার মূল ইচ্ছার অবদমন শুরু হয়ে গেল ; আমার বাসনাকে অন্যের নজরের বাইরে রাখতে গিয়ে, নিজেকে হাস্যকর না করে তুলতে চেয়ে আমি ইচ্ছাটাকে গিলে ফেলতে চাইলাম এবং এই অবদমনে পরাহত ইচ্ছা স্থান পেল অচেতনে। এখন থেকে অপরিতৃপ্ত ইচ্ছাটি অচেতনে চাপা থাকা এবং না থাকার ইচ্ছায় সচেতনের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে—যে কারণে আমরা বেফাঁস কথা বলে ফেলি, বা কখনো-সখনো বেসামাল আচরণ করে থাকি। এ সবের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হচ্ছে অবদমিত ও অচেতনাবদ্ধ ইচ্ছার কথারা ফাঁকেফোকরে সচেতনে প্রবেশ করে বেতাল-বিঘ্ন ঘটাতে চাইছে। ব্যাপারটা এভাবেই আসছে।

তাহলে কি এমন একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে না যে বিচ্ছিন্নতা আর অবদমন প্রায় কাছাকাছি অঞ্চলেই ক্রিয়াশীল ?

দুটোর উপস্থাপন দু'রকম, পার্থক্য শুধু এটুকুই। নয়তো সাদৃশ্য যথেষ্ট (এই দু'ধরনের উপস্থাপনের জন্য আমাদের খাটতে হচ্ছে, আরো বহু কথা টানতে হচ্ছে)। অবদমন যখন শুরু হয়, অবদমিত ইচ্ছা যখন অচেতনে সুরক্ষিত থেকে সচেতনকে চোরাগোপ্তা আক্রমণে পরাস্ত করার সংকল্প নেয়, তখন সেই লড়ালড়ির অনিবার্য ছবিটা বুঝাতে তীব্রভাবে চলে আসেন কার্লমার্কস, কারণ অবদমন ঘটাচ্ছে যে সমাজ সেই সমাজের এত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ মার্কসের আগে কেউ করে উঠতে পারেননি। অতএব মার্কস।

মার্কস বলছেন শ্রমের জন্য মানুষ তার প্রজাতিসত্তা পেয়েছে, সে শ্রম করে, শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করে। মৌমাছির বাসা বানাবার মতো গোঁত্তা খাওয়া কাজে মানুষ বিশ্বাসী নয় এবং শ্রম দিয়ে সে নতুনত্ব আনতে চাইছে বলে তার প্রজাতিসত্তার এত দাপট, এত আধিপত্য। মার্কস বলছেন এই শুভময়তায় কলঙ্ক পড়ে তখন থেকেই যখন বিনিময়প্রথায় আমরা বাঁধা পড়ে যাই। বিনিময়প্রথা সমাজ ব্যবস্থায় ধারাবাহিক পদক্ষেপের ফসল, সেটা আসবেই এবং মানুষের শ্রম ও সৃষ্টির দুরন্ত বাসনা (কোন বাসনা? ইদ না ইগো-র?) তাকে আনবে। আবার বিনিময় প্রথাতেই আমাদের স্বাধীনতার নির্বাসন, স্বাধীনতার অবদমন—কারণ এই সময়ে মানুষের শ্রম মানুষের থেকে আলাদা হয়ে যায়, শ্রমও একটা বিনিময়যোগ্য পণ্যের চেহারা নেয় যাকে আমরা শ্রমশক্তি বলি, দার্শনিক সংলাপে যা বিচ্ছিন্ন শ্রম (alienated labour) হিসেবে স্বীকৃত।

ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল? যে সমাজে ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত 'আমি'দের ইচ্ছারা প্রকাশিত না হবার যন্ত্রণায় অবদমিত হয়ে ব্যক্তিগত চেতনায় অনিবার্য চোরাবালির সৃষ্টি করছে, সেই সমাজে সেই একই মানুষেরা নিজেকে বিক্রি করছে, বিক্রি করছে নিজেরই বিশেষ একটা আকারকে যা বিক্রীত হয়েও মানুষের সাথে থাকছে, বসবাস করছে এবং একটা বিক্রীত বোঝাকে কর্মঠ রাখতে কী উদগ্রীবই না থাকছে মানুষ! যাকে সে বেচে দিয়েছে, তাকে সুস্থ সবল রাখতে কতই না তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সস্ফূর্তি হাস্য নৃত্য গীত টি. ভি মদ্য পদ্য গদ্য প্রবন্ধ চর্বন ধর্ষণ। শ্রমশক্তি কথাটার কত বিকৃত মনোবিকলন হতে পারে সেটা মার্কস ধরেই বিবেচ্য। শোষণসর্বস্ব অর্থনৈতিক চক্র শ্রমশক্তি নিষ্কাষণের নিত্য নতুন পন্থা পদ্ধতি আবিষ্কারে তৎপর। যতই মানুষ আর মানুষের শ্রমে ফাটল প্রকট হয় ততো বাড়ে মানুষটির সৃষ্টিজনিত হতাশা (কারণ তার মনোনীত সৃষ্টি আর সে এক আসনে বসছে না)। সৃষ্টিজনিত এই বিক্ষোভ ক্রমে আত্ম-অসন্তোষ আনে। আগেই বলা হয়েছে মানব প্রজাতির বড় বৈশিষ্ট হ'ল সে শ্রম করতে পারে ও শ্রমকে সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে পারে, সেটা ব্যহত হলে নিজের ওপর অসন্তোষ স্বভাবতই দৃঢ় হয়ে ওঠে।

এবং এই ছবিতে অবদমন ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমি আছি আর আমার শ্রম আছে (যদি মার্কসপন্থী হই), শ্রম এবং শ্রমসাধ্য সৃষ্টি আমার অন্যতম আদি ইচ্ছা (এখানে আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট-স্কুলের সঙ্গে একমত)। অন্যদিকে আমার মুখোমুখি একটা সমাজ, যে সমাজ বিনিময় প্রথার ওপর ফুটন্ত, যে সমাজ

আমাকে দাস বানাতে উদ্যত। তাহলে ইচ্ছার উদ্গমন মানে হল ইচ্ছার অবদমন (ফ্রয়েডের মতে) অথবা ইচ্ছার বিক্রি (মার্কসের মতে),—যাকে বিক্রি করছি সে কি কখনো আমার একান্ত চাহিদার আওতায় থাকবে? থাকবে না? অন্যদিকে সৃষ্টি করার প্রবণতা নষ্ট হয়নি (হয় না বলেই মার্কস সাম্যবাদী সমাজের প্রকল্প দিয়েছিলেন), ফলে সেটা হয়ে যায় অবদমিত: ফ্রয়েড বলেছেন সেটা অচেতনে থাকছে আর সচেতনে নিদ্রাহীন কড়া নেড়ে যাচ্ছে। আঘাত আসছে।

কি সেই আঘাত?

আঘাতের কথা জানতে এবার আর মার্কসে ফেরা নয় (কারণ মার্কস নিয়ে আলাদা বিশ্লেষণ আমি অন্য কোথাও করেছি, আমার এখনকার লক্ষ্য হচ্ছে ফ্রয়েডকে সম্ভবপর নতুনভাবে বোঝা, আমরা ফ্রয়েডকে সামনে রেখে তাই শুরু করব পরবর্তী আলোচনা) কি সেই আঘাত?

একদিকে সৃষ্টিশূন্যতা অন্যদিকে অচেতনে চেপে থাকা ক্ষোভ আমাকে ফ্রয়েডীয় শাস্ত্রানুযায়ী মনোবিকলনের কবলে এনে ফেলে। দুভাবে আমার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হতে পারে—কূটতায় কিংবা জটে। বিকৃতিগুলো কখনো দীর্ঘস্থায়ী কখনো স্বল্পস্থায়ী (যেটা আঘাতের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভরশীল)। বিকৃতিগুলো যেমন প্রবৃত্তির ওপর প্রভাব ফেলে তেমনি চেতনাতেও আঘাত দিয়ে থাকে। এই দুদিকের ওপর অত্যাচারের ধরন এবার বোঝা যাক।

৩

প্রবৃত্তিস্তরে ঘটে ইগোর প্রতিরোধ (suppression) ও ইদের বাড়বৃদ্ধি। ইদের যতটা অংশ সমাজ মেনে চলছে, সমাজ বাধা দিচ্ছে না, ততটা অশিক্ষিত অংশ নিয়ম-কানুন-সভ্যতা-ভদ্রতা না মেনে বের হতে থাকে, ব'খে যাওয়া ছেলে যেমন বিড়ি ফোঁকা দিয়ে শুরু করে অ্যাণ্টিস্যোশাল হয়ে শেষ হয়, তেমনি অশিক্ষিত ইদের আহৃত সত্তা থ্যানাটোস তথা ধ্বংসাকাঙ্ক্ষা ইরোসের সুস্থতা না মেনে বেপরোয়া হতে থাকে। এই ধ্বংসাকাঙ্ক্ষার দুটো দিক সম্ভব, কখনো ধর্ষ-কামনা (sadism) কখনো মর্ষকাম (masochism)। বলে রাখা ভাল, ধর্ষকাম ও মর্ষকামকে প্রচলিত মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষা যেভাবে বুঝিয়ে থাকে আমি সেভাবে বলতে চাইছি না। মানসিক বিকৃতির যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডকে আমি দুটো প্রবণতা দিয়ে চিহ্নিত করতে চাইছি। এমন অনেকে আছে যারা

আত্মনিগ্রহে শান্তি পায় আবার কিছু লোক দেখা যায় যারা অন্যনিগ্রহে শান্তি পায়। কেউ মনে করে ইংরেজরা যেভাবে আমাদের বুটের ডগায় দাবিয়ে রাখত সেটাই ছিল প্রকৃত পথ (এটা মর্ষকামনা)।

থ্যানাটোসের মাত্রাবৃদ্ধি বাড়িয়ে তোলে ধ্বংসাকাঙ্ক্ষা, গড়ে ওঠে প্রভুত্বমূলক ব্যক্তিত্ব (authoritarian personality), নিজেকে অন্যের ওপর কায়েম করায় আসে আনন্দ। যখন দেখি অধিকার করার মতো লোক আছে তখন আমার মধ্যে জন্মায় স্যাডিজম, যখন দেখি অধিকৃত হবার মতো শক্তিমান ভয়াল ব্যক্তিত্ব আছে তখন আসে ম্যাসোকিস্‌ম। সব মিলিয়ে এরা ঘটিয়ে তোলে হীনম্মন্যতা (inferiority complex), তেমনি নেতৃমুখাপেক্ষী (idolism), তেমনিই ভ্রান্ত চৈতন্য (false consciousness)।

অর্থাৎ নিজের ক্ষমতা ও প্রখরতা সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞানতা অথবা ভুল বোঝা শুরু হয়। এই ভুল বোঝাবুঝি থেকে আসে নিজের প্রতি নিজের অক্ষম ধারণা, সেখান থেকে গড়ে ওঠে হীনম্মন্যতা। এই একই হীনম্মন্যতা তখন আমাকে কুরে-কুরে খায়। আগেই বলা হয়েছে যে সৃষ্টিকামী চেতনা লোপ পায় না, চাপা থাকে, তাই চাপা পড়া আগুনের মতো ধিকি ধিকি জলে আর জালিয়ে পুড়িয়ে খায় আমাদের। তখন উদ্ধার পাবার জন্য আমার দুটো পথ পড়ে থাকে। এক, গুরুবাদ; দুই, নিজেকে একটা ছদ্ম আভিজাত্যের পোশাক পরিয়ে মহান ভাবা।

এই হ'ল প্রবৃত্তির দিক দিয়ে কু-ফল। আর যখন চৈতন্যের কথা ভাবতে চাই, যখন ভাবি মানসিক বৈকল্য কিভাবে চেতনায় আনছে জড়ত্ব, তখন দেখি :

* অভিন্নতা-হীনতা
* আত্মচৈতন্যে বিভাজন
* আত্ম অবিশ্বাস
* ইচ্ছাশক্তি ধারণ করার অক্ষমতা
* আধারিত ইচ্ছাশক্তি প্রবাহিত করানোয় অক্ষমতা ঘটে।

যে মুহূর্তে আমার মধ্যে একটা ভ্রান্ত চেতনার জাল ছড়িয়ে যাচ্ছে সে মুহূর্তে আমার সচেতন-চেতনায় আসছে বেসামাল অব্যবস্থা। যদি মেনে নিই আমার চৈতন্যের অংশগুলো যথাক্রমে অচেতন মগ্নচেতন ও সচেতন—এবং একথা মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে উন্নত করার অভিপ্রায়ে সচেতনকে যদি বাড়াতে চাই তখন আমি যে কটি প্রজেক্ট নিতে পারি তারা হচ্ছে :

* অচেতনের গণ্ডিকে ক্রমশ সচেতনের সাহায্যে ছোট করতে করতে সচেতনের সীমানা বাড়ানো।
* মগ্নচেতনার ট্যাবু-টোটেমকে সচেতনার সাহায্যে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করে সচেতনের গণ্ডি বাড়ানো।

প্রকল্পের দিক দিয়ে পথ এই। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব হয় না, কারণ ভ্রান্ত চৈতন্য—চৈতন্যের মোহবন্ধন। সচেতনেই যখন একটা জাল জমে যাচ্ছে, তখন ঐ বেসামাল সচেতন দিয়ে কিভাবে অচেতন-মগ্নচেতনকে খাটো করা যাবে? যে যন্ত্র দিয়ে রোগ সারাতে যাচ্ছি সে যন্ত্রটাই যদি বিগড়ে যায় তাহলে রোগের সনাক্তকরণে অসুবিধা চলে আসে, রোগ সারানো তো দূরের কথা।

ফল কি হয়। একটাই 'আমি', অথচ এই গোটা 'আমি'তে ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়। ভ্রান্ত চেতনার বশবর্তী হয়ে আমি এমন একটা আচরণ করি, যাকে না সচেতন না অচেতন না মগ্নচেতন—কোনোভাবেই সামাল দেয়া যায় না। যখন জানছি কাজটা খারাপ করে ফেলেছি তখন আর ফিরে আসার পথ খোলা থাকছে না—কারণ কাজটা হয়েই গেছে। কেইনস তাঁর অর্থনৈতিক চক্রে এরকম একটা সচেতন ইর‍্যাশোনালিটি দেখতে পেতেন, যাকে তিনি অ্যানিম্যালিটি বলতেন। এটা ভ্রান্ত চেতনার জন্য ঘটে থাকে, অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সমাজে একে আমরা দূরদর্শিতার অভাব হিসেবে দেখে থাকি। এটা ব্যক্তিমানুষের মনে আনে ভঙ্গুরতা, সসীম ভঙ্গুরতা। আমিই আমাকে চিনে উঠতে পারি না। ধরা যাক অচেতনে সঞ্চিত কোনো অবশেসন সম্বন্ধে আমি সচেতন হলাম, সচেতন হয়েই অবশেসন কাটাবার একটা প্রজেকট নিলাম—কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল অবশেসনের অনুরূপ আরেকটা বোকামো করে ফেলেছি। এটা ভ্রান্ত চৈতন্যের দরুণই ঘটেছে। 'আমি'র মধ্যে বিভাজন শুরু হয়ে গেছে, সে কারণে গোটা 'আমি'কে আমি চিনে উঠতে পারছি না। চেনার অভাবে জন্ম নিচ্ছে আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, আমি জানতেই পারছি না আমার প্রকৃত শক্তি কতটা, যেমন (মজা করে বলা হয়) ছোট চোখের জন্য হাতী বোকা বনে আছে, যদিও তার অগাধ শক্তি। যেই নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাব আসছে, অমনি জাগছে আত্ম-অবিশ্বাস—নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। একটা কাজ খারাপ জেনেও—করব না করব না প্রতিজ্ঞা করেও—কাজটা করে ফেলি, আক্ষেপ করি : দূর আমি কি আর আমাতে আছি, আমাকে আর বিশ্বাস নেই। এবং ঐ আত্ম-অবিশ্বাস আনে প্রজেক্ট-গঠনে-দ্বিধা; এবার আর প্রজেক্ট

নিতেই সাহস করবো না, যা চলছে তাই চলুক এরকম স্থিতিশীল পরাধীনতায় নিজেকে সাজিয়ে রাখব। অর্থাৎ হয় ইচ্ছাকে ধারণ করার অক্ষমতা আসবে না-হয় চলিষ্ণু ইচ্ছাশক্তিকে প্রবাহিত করাতে অক্ষমতা আসবে। দুটোই ঘটবে, ঘটেও।

চৈতন্যে এই বৈকল্য জানার পর একটা প্রশ্ন উঠে আসে, জানতে ইচ্ছে হয় —শ্রম যখন স্রষ্টার পূর্ণতা অথবা স্রষ্টার সার্বিক 'আমি'র বিজ্ঞ পরিভ্রমণ, তখন সেই একই শ্রম কিভাবে শ্রমশক্তির দহে নিজেকে ডুবিয়ে মারে এবং এ জাতীয় বিচ্ছিন্নতা কিভাবে গড়ায়। এবং মার্কস যে সাম্যবাদী সমাজের কথা বলেছেন সেখানেই বা কিভাবে শ্রম তার পুরো সততা ফিরে পাবে—দুর্মতি ঘুচে যাবে? আদিম কমিউনিজমে মানুষ সৎ ছিল, সুস্থ ছিল, নিজেকে 'সভ্য' করতে গিয়ে কার্যত অসভ্য করে ফেলছে নিজেদের, অশ্বত্থামার যে বাণ ছাড়া হয়ে গেছে তাকে কি সে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারবে? মার্কস বলেছেন পারবে, পারাটাই তার শপথ-সংগ্রাম-সমীক্ষা; অন্যদিকে আজকের সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলো দেখাচ্ছে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অতএব?

৪

একটু অন্যভাবে বিচ্ছিন্নতা এবার আলোচিত হবে। মূলে থাকছেন ফ্রয়েডই, তবে ফ্রয়েডের সময় ছেড়ে এবার আমরা বিশ-শতকের এক তাত্ত্বিকের ভাষ্য অনুসরণ করে ফ্রয়েডীয় বিচ্ছিন্নতাকে বিশ্লেষণ করতে চাইব। দেখব ফ্রয়েডের সিস্টেমকে আরেকটু ঘনিষ্ঠে আনা গেলে সেই ঘনিষ্ঠতা বর্তমান সমস্যাকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। আমাদের নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক হচ্ছেন জুর্গেন হবারমাস (Jurgen Habermas)।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রখ্যাত তাত্ত্বিক থিওডোর অ্যাডোর্ণোর সহকারী হিসেবে হাবারমাস-এর (জন্ম ১৯২৯) প্রথম গবেষণা-জীবন কাটে। সে সময়ে (পঞ্চাশের দশকে) ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল মার্কস আর ফ্রয়েডকে রাজনীতি-সমাজনীতিতে একইসঙ্গে প্রয়োগ করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল, হাবারমাসও ভিড়ে গিয়েছিলেন সেকালে। কিন্তু বেশিদিন তিনি ঐ স্কুল গণ্ডীতে বাঁধা থাকেননি, স্কুল প্রবর্তিত ক্রিটিক্যাল থিওরির ওপর যাবার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যুদ্ধমান সব তত্ত্বগুলো যেমন তিনি অ্যাকশন থিওরিতে টেনে আনার চেষ্টা করেছিলেন, যে কাজটা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের আর কেউ করে উঠতে পারেননি।

দার্শনিক এই কৃতিত্বের সাথে সমাজতত্ত্বমূলক গবেষণাও চলে এসেছে, এখানে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নির্ভর। হাবারমাস দেখেছিলেন রুশ সমাজতন্ত্র স্টালিনী তাণ্ডবতায় পিষ্ট, এদিক-ওদিক গণঅভ্যুত্থান (পশ্চিম ইউরোপের দিকে তাকিয়ে বলা হচ্ছে) ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কবলে মাথাকুটে মরছে, মার্কসতত্ত্বকে ঠিকভাবে না বোঝার ফলে কখনো অতিসরলীকরণ, কখনো কুটতা এসে যাচ্ছে। তবে প্রত্যেকটা ত্রুটির মূলে রয়েছে মার্কস আর ফ্রয়েডকে একসঙ্গে না-ব্যবহার—এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন হাবারমাস। তাই এই দুটো সিস্টেমকে এক করার কাজই হয়ে উঠেছিল তাঁর অন্যতম গবেষণা-ধ্যান যেখান থেকে আমরা দেখলাম বর্তমান ধনবাদী সমাজে মানবমন ও মানবজীবন কিভাবে বেসামাল পথে চলেছে তার অসাধারণ ব্যাখ্যা। (বইটির নাম : Knowledge and Human Interests, 1971, London, Heinemann)।

ফ্রয়েডে আসতে গিয়ে হাবারমাস ফ্রয়েডের দর্শনকে বুঝাতে চেয়েছেন, এখানে তিনি ম্যাসলাও-এর উল্টো কাজ করেছেন। ম্যাসলাও ফ্রয়েডের দর্শনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে ফ্রয়েডের থেরাপিউটিক ব্যাপারটার দিকে নজর দিয়ে এবং সেই অনুযায়ী মনোচিকিৎসা করে মার্কিন মহলে পর্যাপ্ত মান যশ কুড়িয়েছেন—তাঁর দিক থেকে হয়ত কাজটা ঠিক করেছেন, কিন্তু ফ্রয়েড-গবেষণার পক্ষে ব্যাপারটা বিপজ্জনক। অন্যদিকে হাবারমাস ফ্রয়েডের পথে চলতে চেয়েছেন। ফ্রয়েড বলতেন তিনি দর্শনেরই অনুসন্ধানী ছাত্র—হাবারমাস ঠিক সেই অনুসন্ধানটাকে বুঝতে চেয়েছেন আর সেই বোঝায় যিনি প্রথম আলোচিত হবার যোগ্য তিনিই প্রথম আলোচিত হলেন, আসলেন শ্রদ্ধেয় হেগেল।

৫

প্রচলিত ঘটনা, খুনী খুন করছে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন খুন করছে? উত্তর পাওয়া যাবে অবস্থানগত অর্থ নৈতিক অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য যাচাই করে। কিন্তু হেগেলের গভীরতা আরও বেশি। হেগেল খুনী আর খুন হওয়া ব্যক্তিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব খুঁজে পেলেন এবং দ্বন্দ্বটা জন্ম নিচ্ছে খুনীর মানসিকতা থেকে—এমনটা দেখলেন হেগেল। খুন করার প্রাক্-মুহূর্তে খুনীর মানসিকতায় দুটো ভাগ আসে—অস্তিত্বগত (existential) ও সত্তাগত (essential)। তার অস্তিত্ব তাকে বলে দেয় তুমি একজন খুনী, তোমাকে খুন করতে হবে এবং ঐ লোকটাকেই খুন করতে হবে যদি তোমার অস্তিত্বকে তুমি টিকিয়ে রাখতে

চাও। অন্যদিকে তার সত্তা খুন-হতে-যাচ্ছে-এমন ব্যক্তিটিকে সরাসরি মাপতে চায়। এই মাপজোকে খুনী তার বস্তুর মধ্যে খুঁজে পায় নিজস্ব annihilated essence, এই সত্তাগত সাদৃশ্য পাবার পর অপরাধমূলক কাজটিতে এগোন সম্ভব হয়।

হেগেলীয় এই দ্বান্দ্বিক-পরিস্থিতিকে হাবারমাস ফ্রয়েডে এনে ফেললেন। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের যদি গভীরে ডুব দেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সব মানুষই যেন ফ্রয়েডের কাছে কমবেশী নিউরোটিক—এই অসুস্থতা হেগেলীয় নৈতিক দ্বন্দ্বের মতো occassional নয়, natural। তার মানে হেগেল যখন অকেশনাল উদাহরণ হিসেবে খুনী আর খুন হওয়া ব্যক্তির মধ্যবর্তী ঘটনায় খুনীর মনে একটা দ্বন্দ্বকে দেখছেন সেটা ফ্রয়েডতত্ত্বে সার্বিক আকার পাবে, কারণ ফ্রয়েডের মতে সব মানুষই কমবেশী নিউরোটিক—যেভাবেই হোক, আঘাত পাচ্ছে, আঘাত দিচ্ছে। তার মানসিকতা তাই অনেকটা খুনীর মানসিকতার মতো—খুনী তো অকারণে খুন করে না, সে আঘাত পেতে পেতে এমন একটা স্তরে পৌঁছয় যেখানে তাকে পাল্টা আঘাত দেয়া ছাড়া অন্য কিছু করার থাকে না। আবার সাধারণভাবে বিবেচনা করলে দেখি আম-জনতার মধ্যে আঘাত-পাওয়া বা দেয়াটা একটা সহনীয় সীমার মধ্যে থেকে থাকে যেটা মানুষকে খুনী বানায় না, তবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতেও দেয় না। সে দিকটা বিবেচনা করে বলছি হেগেলীয় খুনী-মনস্তত্ত্ব যদি নিউরোটিক সাধারণ মানুষের মধ্যে ফেলা যায় তাহলে অন্যায় কিছু হবে না, বরং লাভ হবে, ফ্রয়েডীয় দর্শনকে ঠিকমত বোঝা যাবে।

এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন মানুষের ইগো যখন নিজেকে চিনতে চাইছে অর্থাৎ মানুষ যখন তার দোষ-ত্রুটি-অজ্ঞানতা কাটিয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছে তখন তার থেকে-যাওয়া দোষ-ত্রুটি-অজ্ঞানতার মধ্য দিয়ে ইগো নিজেকে অন্য একটা পোশাকে দেখছে। ইগো দেখছে এটা আমার দেহ আমার মন, অথচ কতই না বিকৃত আমার মন। যার অর্থ হল ইগো নিজেকে একটা নেগেটিভ শক্তি হিসেবে মনে করছে, যে শক্তিটা নাকি সে-ই—অথচ সে নয়। ইগোর মধ্যেও দ্বন্দ্ব পরিষ্কার হয়ে আসছে।

বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে আনা সবচেয়ে বড় অভিযোগ (দার্শনিক মহলে) হচ্ছে ফ্রয়েডীয় সিস্টেমের মানুষ ever neurotic, মানসিক বিকৃতি যাদের কোনদিনই ছাড়বে না। এই অভিযোগ এনেছেন এবং মেনেছেন প্রায় সব কোণেরই দার্শনিকেরা, বস্তুত এই অভিযোগ থেকে

ফ্রয়েডীয় মনোদর্শনে ভাগ উপভাগ শুরু হয়ে গিয়েছিল আর এই পেসিমিজম স্বীকার করেছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকেরা যাদের উত্তরসূরী হলেন আমাদের হাবারমাস। হাবারমাসরা দেখলেন আজকের ধনবাদী সভ্যতার কুপ্রভাবে মানুষ নিউরোটিক হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, তবুও মানুষ একদা মুক্ত ছিল এবং একদিন মুক্ত হবেই। মানুষ তার স্বাধীনতাকে পুরোপুরি চিনে নেবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে বলে আমরা পথ চলছি, আর আমাদের পথ চলা সম্বন্ধে যদি কোনো সংশয় না থাকে তাহলে ফ্রয়েডীয় পেসিমিজমকে আমরা গ্রাহ্য করব না, করব তো না-ই বরং তার বিরোধিতা করব এবং বিরোধিতা করতে হলে ফ্রয়েডকে না মেনে এক পা এগোনো সম্ভব নয়, কারণ ফ্রয়েডেরই সে প্রতিভা আছে যার সাহায্যে তিনি মানুষের অসহায়তাকে সঠিক চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় মানুষের নিউরোটিসম সত্যি কথা এবং আরো সত্য নিউরোটিসমের-ঊর্ধ্বযাত্রা—যে যাত্রা-তীক্ষ্ণতা আমার আছে বলে আমার ইগোই আমাকে দেখাচ্ছে আমার বর্তমান বন্ধ্যাদশা—বিস্ময়ে বিমূঢ় হচ্ছে আমার ইগো—এই আমি, এই আমার সত্তা, অথচ এই বন্ধ্যা আমিটাও নাকি 'আমি'?

প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হাবারমাস হেগেলের প্রস্তাবনাকে যেমন ফ্রয়েডীয় সিস্টেমে এনে ইগোর ভেতরকার দ্বন্দ্ব বুঝলেন, তেমনি ফ্রয়েডীয় সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ বস্তুটাকে বার করে আনলেন। হেগেলকে ফ্রয়েডের মধ্যে সুপারইম্পোস করলেই তো কাজ শেষ হবে না, ফ্রয়েডের রীতির সঙ্গে হেগেলকে খাপ খাইয়ে ব্যবহার করতে হবে, তবেই হেগেলের সুপ্রয়োগ এবং ফ্রয়েডের তত্ত্বগত শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং ইগো যে দেখল—এই আমি, আমিই, অথচ আমি নই!—সেটা ফ্রয়েডের নিজস্ব শিক্ষায় কতটা বৈপরীত্য অথবা সাদৃশ্য অথবা নতুনত্ব আনল সেটা বুঝতে হলে জানতে হবে ফ্রয়েডের সিস্টেমটা কি—কখন ফ্রয়েডে ইগোর উপস্থিতি এসেছে।

আমরা জানি ফ্রয়েড ইগোর প্রসঙ্গ তখনি টেনেছেন যখন ইদ তাঁর আলোচনায় এসেছে। ফ্রয়েড এভাবে শুরু করেছেন যে মূলে আছে ইদ—তার প্রবৃত্তি নিয়মকানুন ইগোর বিপরীত দিকে চলে। সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, প্রকাশের পর অজ্ঞান বাসনা যদি শিক্ষিত ইচ্ছায় রূপান্তরিত হতে পারে তাহলে ইগোর আঞ্চলিক মাত্রা বাড়ে। মানুষের মধ্যে নিউরোটিসমের আগুন জলন্ত দেখে এবং মানুষের মধ্যে জিঘাংসা (সেই হেগেল!) প্রত্যক্ষ করে ফ্রয়েড বলেছিলেন ইদ আর ইগো হচ্ছে ঘোড়া আর সওয়ার—সওয়ার ভাবছে ঘোড়ার

পিঠে বসে আছি, যা হুকুম দিচ্ছি বা দেব ঘোড়া তা মানতে বাধ্য। যদিও ব্যাপারটা তা নয়—পথ চলছে এবং চালাচ্ছে ঘোড়াই, তার সওয়ার নয়। ফ্রয়েড বললেন ইগো নিজেকে কেউকেটা মনে করলেও কার্যত চালকের দায়িত্বভার বর্তেছে ইদের ওপর—সভ্যতাকে নিয়ে যাচ্ছে ইদ, ইগো বৃথাই নিজেকে চালক বলে ভুয়ো গর্ব করে থাকে।

ফ্রয়েড এভাবে বললেও হাবারমাস তা মানলেন না (এটা আমরাও মেনে নিই না)। 'ইদ' শব্দের মধ্যে যে অতীত অংশটা আছে তাকে নাকচ করতে চাইলেন হাবারমাস—হাবারমাসের চোখে ইগো আছে বলেই ইদ আছে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বোঝা সহজ হবে। একটা বাচ্ছা, সে ধুলো-বালি-কাদা-মাটি যা পায় তাই মুখে পোরে, চেখে দেখে, সে জানে না এ-সব তার করা উচিত কি না। যখনি তার খাদ্য সম্বন্ধে একটা পজেটিভ স্বাদবোধ আসে তখনি সে ধুলো-মাটি দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার কাছে অতীতের ধুলো-মাটি খাওয়াটা কিন্তু ইতিহাস-স্মরণ-শিক্ষা-অভিজ্ঞতা নয়, মাছ, ভাত খাবার পরই তার ইতিহাস শুরু হচ্ছে। ঠিক তেমনি মানুষের রাজ্যে। একটা কাজ করে ফেললাম,—সেটা ইদ থেকে উঠে এসেছিল, নাকি সেটা ইদ-আধিপত্যের কাজ, তা তখনি বুঝব যখন তুলনামূলকভাবে ইগো আমাকে ঘিরে ধরছে, তুলনা করে তবেই ইদকে ইদ বলে বুঝি, ইদকে ইদ বলে চিনি—ইগোর তুলনায় ইদত্ব কতটা সেটা যাচাই করতে পারি।

হাবারমাস পৌঁছলেন এখানে, ফ্রয়েড নতুন আলোতে পৌঁছলেন এভাবে। এইবার ফ্রয়েডে সুচারু তন্নিষ্ঠ হলেন হেগেল—ব্যাখ্যাকার হাবারমাস।

একদিকে হেগেল থেকে দেখছি একটাই 'আমি' তার কিছু স্বাধীন সত্তা দিয়ে বাকি পরাধীন অংশ দেখে বিস্মিত হচ্ছে—দ্বান্দ্বিক উপদ্রবে বিগ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে ফ্রয়েড দিয়ে বিচার করলে স্বাধীন সত্তাটাকে ইগো আর পরাধীন অংশটাকে (—প্রবৃত্তির পরাধীনতা, প্রাণীত্বে পরাধীনতা—যেভাবেই ধরি না কেন !) ইদ বলে চেনাজানা থেকে। ইগো আছে বলে ইদকে চেনা যাচ্ছে, আর ইদ যদি প্রবৃত্তির দাসত্ব হয় তবে দাসত্ব চিনব তখনি যখন স্বাধীন-ইগো আমাকে বদ্ধ রাখবে। হেগেল ফ্রয়েড ক্রমশ যেন মিলেমিশে যাচ্ছেন।

মিলমিশের intersection থেকে বিচ্ছিন্নতা (ওটাই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়) বেরিয়ে আসছে। হাবারমাসীয় হেগেল আর হাবারমাসীয় ফ্রয়েড এককথায় নিষ্ঠ হবে যদি বলি Id=Alienated Ego। সুস্থ আমি থেকে

বিচ্ছিন্ন হবার জন্য অসুস্থ আমির জন্ম ও তার তাণ্ডব। এবং তার তাণ্ডব নৃত্য তখনি বুঝছি যখন সুস্থ 'আমি' আমাকে টোকা মারছে, তার মানে আমার অসুস্থ 'আমি' একচেটিয়া কর্তৃত্ব করতে পারছে না, সেও দগ্ধ হচ্ছে—সব মিলিয়ে সুস্থ 'আমি' থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি বলে ইগো থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। ফলে বিচ্ছিন্নতার জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই এককথায় Id=Alienated Ego।

এই মিলের স্বপক্ষে অনেকগুলো যুক্তি আছে। হাবারমাসের ভাষ্যকার চিন্তাবিদ কীট বলছেন : Thus whereas for Habermas the apparent objectivity of the id is only apparent, since it is really an alienated form of subjectivity which can be restored to consciousness, this is so for Freud only of one component of the id, the repressed, and not for the other, the instincts. In effect, Habermas wishes to understand the id in some way as...he understood the naturalness of distorted communication, the reified character of ideologies : their apparent objectivity is in fact an alienated subjectivity. The id is not then an ineliminable feature of all human activity, as it was (partly) for Freud, but an element in the...alterable character of the object domain of a critical social theory (Keat R : The politics of Social Theory : University of chicago press : 1981)

কি পেলাম তাহলে ? হেগেলীয় দ্বন্দ্ব দিয়ে ফ্রয়েডীয় প্রকল্প বোঝা এবং বোধের নতুন স্তরে উর্ধায়ন—পাই এটাই। নতুন দৃষ্টি এবার আরেকটু গভীরে প্রবেশ করায়। যখন জানছি id as alienated ego, তখন মনে হয় বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় সিস্টেম যা বোঝাত, বর্তমানের হাবারমাসীয় সূত্রে, তার গভীরতা বেড়েছে অনেক বেশী। বিচ্ছিন্নতা যদি প্রবৃত্তিগত হয়, তাহলে একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপ্লবে সেটা মুছে যাওয়া সম্ভব নয়, যেতে হবে অনেক দূর, আরো অনেক দূর।

ফ্রয়েডের চোখে ইদ ছিল প্রবৃত্তিজাত। ইচ্ছারা যেমন ইরোস থ্যানাটোস আর অবদমিত ইচ্ছা। প্রবৃত্তিতে ইরোস থ্যানাটোস যে একসঙ্গে থাকতে পারে না সে নিয়ে কড়া যুক্তি সাজিয়েছিলেন হাবারমাসের শিক্ষাদাতারা—ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রথম দিকের সদস্যরা। তারা বলেছিলেন প্রবৃত্তিতে থাকছে ইরোস আর

শ্রম, থ্যানাটোস ডেরিভেটিভ হয়ে পরে আসছে। হাবারমাস সেটা মেনে নেন, মানার পর নিজের ধারণাকে কার্যকর করতে গিয়ে তিনি দেখলেন : আমি তো আমিই এবং ইদ যখন ইগোর পরক অংশ তখন ইদে থাকবে ইগোচ্যুত ইগোরা অথবা অবদলিত ইগোরা।

ছবিটা তাহলে কি দাঁড়ায় ?

ছবি এই হয় : ইদ 'আত্ম'র একটা অংশ হয়ে উপস্থিত থাকে এবং সে ডিফেন্সের নিয়মকানুন মেনে বাইরের জগতে আসতে চায়। আর ইগো হচ্ছে একটা এজেন্সি যে বাস্তবনীতি আর সুখনীতির দ্বন্দ্বকে সইয়ে প্রজাতিসংরক্ষক বাধানিষেধ মেনে (একে ফ্রয়েডীয় সুপারইগো বলা চলে) ইদের সাথে বাস্তবতার মিলমিশ রেখে আত্মপ্রকাশিত হতে চায়।

তফাৎ তাহলে কোথায় ?

ফ্রয়েড ইদ, ইগো, সুপারইগোর মধ্যে একটা compartmentalisation রেখে দিয়েছিলেন—যেন পাশাপাশি তিনটে স্পষ্ট আধার আছে যারা সু-যুক্ত, যাদের একটার সাথে অন্যের সম্পর্কের গতি আলোকগতিতুল্য, কিন্তু আধারগতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা ভাগ থাকবেই। অন্যদিকে হাবারমাসের ধারণায় এহেন compartmentalisation পাই না, একটাই আধার পাই যাতে বিভিন্ন ঘনত্বের তরল রয়েছে এবং ঘনত্বের ক্রম অনুসারে তারা একে অন্যের ওপর ক্রমিকভাবে চেপে বসে আছে,—যার ঘনত্ব বেশি অর্থাৎ যে একটু বেশি অবদমিত সে থাকছে নিচে। যেমন হালকা ইগো ভারি ইদের তুলনায় অনেক ওপরে থাকছে যদিও তরলগুলোর চরিত্র এক। হাবারমাস এই দেখালেন, নতুনত্বও এটা (অবশ্য এই বিশ্লেষণ একান্তই আমার, অন্যেরা একমত নাও হতে পারেন)।

হাবারমাসের মতে ইদ হচ্ছে naturalness of distorted communication এবং দর্শনবিজ্ঞতার reified character, যদিও ইদ হিসেবে তাদের আপাত এক ধরনের objectivity আছে, কিন্তু প্রকৃতভাবে তারা হচ্ছে alienated subjectivity।

৫

স্বাভাবিক 'অন্তর' অতঃপর হয়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক, distorted communication হবেই, বর্তমান ধনবাদী সমাজ-শোষণসর্বস্ব সমাজেই সেটা ঘটবে। ফলে

ইগোর অবদমন স্বাভাবিক, অতি স্বাভাবিক, অতএব ইগোবিচ্ছিন্ন ইগোত্ব, নাম যার ইদ।

এই ছবিতে আমি আমার অসহায়তা বুঝে ফেলি। যখনি দেখছি distorted communication খুব স্বাভাবিক আকারে আমার ইগোকে ইদে নামাচ্ছে এবং নামিয়ে যে ক্ষান্তি দিচ্ছে তাও নয়—ইগোবিচ্ছিন্ন পরিস্থিতি আনছে। তখন আমার বিচ্ছিন্ন দশা সম্বন্ধে আমাকে নতুন কিছু বলতে হয় না, যে লোহার শেকল আমাকে বেঁধে রেখেছে সেটা যে আমার মধ্যে রয়েছে—এটা জানতে পেরে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ি।

হাবারমাসের দৃষ্টিভঙ্গি এরকমই ছিল। হাবারমাস একটা ভুল করে ফেলেছিলেন (আমার মতে), ধনবাদের সংখ্যাদম্ভকে তিনি শাশ্বত ভেবে ফেলেছিলেন। হতে পারে আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশেরা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র থেকে কিছু আলাদা নিয়মে চলে (তার মধ্যে থেকেও তো গর্বাচভ একটা প্রাগ্‌মেটিক কোণ বেছে নিচ্ছেন—এটা বহুদিনবাহিত অচলায়তন অবসানের জন্যই সমর্থনযোগ্য)। এই আলাদা পথে চলাটা হাবারমাসের ইনহিবিশন আনতে পারে, কিন্তু ভুললে চলবে কেন আমাদের মার্কস ছিলেন, ছিলেন লেনিন। যখন একটা মার্কস পেয়েছি, লেনিন পেয়েছি মাও পেয়েছি, তখন আশাবাদী হতে আপত্তি কেন ? মানুষ ভাবছে মানুষ ভাববে মানুষ আসবেই—এটা আমাদের প্রথম স্বীকার্য হওয়া উচিত, এটা ইতিহাসসম্মত, বিজ্ঞানসম্মতও। আর এই যদি সত্য তবে Id=alienated ego হলেও স্বাভাবিকে সবকিছু অস্বাভাবিক একথা মানতে ও মানাতে আপত্তি এসে যায়। মেনে নিলাম ইদ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ইগো, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়, কারণ এর ঊর্ধ্বে যাবার ইচ্ছে আছে বলেই আমরা ত্রস্ত হই, আবার লিখি, ভাবি, নতুন দিকে সংকট সৃষ্টি করি।

এইবার কিন্তু বিষয়টি মনসমীক্ষণের দায়দায়িত্ব পর্যায়ে চলে আসছে। এখন প্রশ্ন হবে অচেতনের লোপ নাকি ইগোর বলিষ্ঠতা—কোন্‌টা সেই পথ ?

ব্যাপারটা 'নিজস্ব বিপ্লবের' দিকেই চলে আসছে। যদিও ফ্রয়েড কোন সদুত্তর দিতে পারেননি, দেননি হাবারমাসও। ফ্রয়েড বলেছিলেন ব্যক্তি-মানুষকে ইদ থেকে ঊর্ধ্বায়ন করতে হবে, তবে সম্ভব হবে মানুষের অবিচ্ছিন্ন সৎ-দশা। বলে রাখা ভাল, সমষ্টিক মানুষের মুক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন ফ্রয়েড—একটা সমাজবিপ্লব কি একটা অর্থনৈতিক পরিবর্তনযোগ্য বিপ্লব যে ইদকে শিক্ষিত করতে পারবে এমনটা ফ্রয়েড মানতে পারেননি। অথচ ব্যক্তিগতভাবে তিনি

সাব্লাইম করতে পেরেছিলেন। এটা কিভাবে সম্ভব হয়? সামাজিক পথে নয়—নিজস্ব বিপ্লবে মুক্তি—একথা আমাদের মেনে নিতে বাধা আছে। একটাই যুক্তি দিতে পারি: আমি সাব্লাইম হয়ে উঠলেও সামাজিক অশুভ শক্তি (যদি থেকে থাকে) আমার সাব্লিমেশনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবেই—একমাত্র সামাজিক মানুষ দিয়ে তার কুপ্রভাব রোধ করা যেতে পারে। সামাজিক পরিবেশের ডি-টোটালাইজড ফ্যাক্টর আমি; আমার মতো অযুত কোটি ডি-টোটালাইজড ফ্যাক্টরদের রি-টোটালাইজ করেই সম্ভব সামাজিক বিপ্লব, যে বিপ্লবে শোষণ বাস্তবভাবে হটে যাবে, তা অবশ্যত হবে মানসিক জগৎ থেকেও। এই দ্বিতীয় ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞান ছিলেন ফ্রয়েড।

সেদিক ছেড়ে ফ্রয়েড-হাবারমাস চলে আসেন 'নিজস্ব' বিপ্লবের দিকে। প্রশ্নটা উদ্যত থেকে যায়: কিসে মুক্তির পথ? অচেতনার অবলুপ্তি নাকি ইগোর বলিষ্ঠতা? কোনটা কাম্য? কার্যকর?

৬

সেই প্রথম দিকের কথা বলতে হয়: বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলাদা কোনো গবেষণা ফ্রয়েড করতে চাননি। তিনি ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা তথা মনোবিকলনের কার্য-কারণ অনুসন্ধানে ইদ ইগোর দ্বন্দ্বসংঘাতকে এতটাই সজীব দেখেছিলেন যেখানে আলাদাভাবে বিচ্ছিন্নতার আলোচনা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছিল। তাই ফ্রয়েড থেকে বিচ্ছিন্নতা-উত্তীর্ণ-মুক্তির বৃত্তান্ত খুঁজতে গিয়ে শূন্য ছাড়া আর কি পেতে পারি? যা নেই তাকে এনেছি (যেন এটাই যথেষ্ট) কারণ বিচ্ছিন্নতা আমাদের চোখে মনোবিকলন,—সেই মতের সমর্থনে আমরা মনোবিকলনের ঠিক সেই বিশেষ জায়গায় পৌঁছতে চেয়েছি যেখানে ঘা দিয়ে সমাজ মানুষকে পৃথগন্ন করার অপচেষ্টা চালু রাখে, দেখেছি খোদ ইগো আর ইদের মধ্যে একটা পরক সম্পর্ক বজায় আছে। সম্ভবত এটাই অনেক। যা নেই তাকে আনা হয়েছে। অধিকন্তু বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণ? ফ্রয়েডে? অস্বাভাবিকে? আন্তরিকই অসম্ভব!

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

এ রে ন্দি রা

অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই বিভিন্ন কাগজের হ'য়ে চলচ্চিত্র সমালোচনা ক'রে এসেছেন। যখন কুবার তথ্য- ও সংবাদ-সংস্থা প্রেনসা লাতিনার কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি মেহিকো চ'লে আসেন, যেখানে ব'সে ১৯৬৬-৬৭তে তিনি লিখবেন 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা', তখন তাঁর জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিলো চলচ্চিত্র সমালোচনা—এবং ছোটো-ছোটো চিত্রনাট্য রচনা। 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' যখন রাতারাতি তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিলে, আর পরে ১৯৮২তে সেই বই তাঁকে জুটিয়ে দিলে সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার, সেই থেকেই হলিউড তাঁর পেছনে নাছোড় লেগে আছে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' নিয়ে একটা ব্লকবাস্টার বানাবে ব'লে—ডলারের অঙ্ক যত আকাশ ছোঁয় গার্সিয়া মার্কেস ততই আতঙ্কে পেছিয়ে আসেন, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও। হলিউড! সে তো খুন ক'রে ফেলবে বাস্তবতার কুহকে ভরা তাঁর বই!

সকলেই জানেন, গার্সিয়া মার্কেস লেখা থেকে লেখায় বই থেকে বইতে কোনো প্রসঙ্গ বিকশিত ক'রে তোলেন। এরেন্দিরার কাহিনীর প্রথম আভাস ছিলো 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'তেই : একটি কিশোরী, দৈবাৎ যে অঘটন ঘটায়, পুড়িয়ে ফ্যালে তার ঠাকুমার বাড়ি, তারপর দেনা শোধ করবার জন্যে জোর ক'রে যাকে দাসত্ব ও বেশ্যাবৃত্তির খাঁচায় আটকে রাখা হয়। লাতিন আমেরিকার 'মাচিসমো'র বিরুদ্ধে এই কাহিনী ছিলো নাশকতামূলক অন্তর্ঘাতই। পরে এই কিশোরীকে নিয়ে তিনি লিখলেন ছোটো উপন্যাস 'সরলা এরেন্দিরা···'। ১৯৮৪তে তাঁরই চিত্রনাট্য থেকে 'এরেন্দিরা' ছবি তৈরি হ'লো। গ্রীক অভিনেত্রী ইরেনে পাপাস দুর্ধর্ষ অভিনয় করেছিলেন ঠাকুমার ভূমিকায়। চমকপ্রদ সেই চলচ্চিত্রে একটা খটকা তবু তৈরি হয়েছিলো : লরা মালভে 'ভিশুয়্যাল অ্যাণ্ড আদার প্লেজার্স' বইতে যাকে উল্লেখ করেছেন 'মেল গেজ' বা মরদ দৃষ্টি বা মাচোদের চাহনি ব'লে, এ যেন তাকেই ইন্ধন জুগিয়েছে। তবু চলচ্চিত্র 'এরেন্দিরা' নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। সেই চিত্রনাট্যে গার্সিয়া মার্কেস অন্য অনেক-কিছুর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন ১৯৭০-এ লেখা আরেকটি ছোটোগল্প, 'মৃত্যুই ধ্রুব···'। এখানে দুটি রচনাই একসঙ্গে দেয়া হ'লো যাতে পাঠক জল্পনা ক'রে নিতে পারেন চলচ্চিত্রে কীভাবে ম্যাজিক রিয়ালিস্‌মের বা কুহকী বাস্তবতার ব্যবহার হয়েছিলো। গার্সিয়া মার্কেস, প্রধানত নিজের টাকাতেই, কুবার লা হাবানায় একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট গ'ড়ে তুলেছেন—তাঁর কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে আরো ছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এ রে ন্দি রা প্রথম ব'লেই এখনও কৌতূহলোদ্দীপক।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সরলা এরেন্দিরা
আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী

এরেন্দিরা যখন তার ঠাকুমাকে স্নান করাচ্ছিলো তখনই তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া শোঁ-শোঁ ক'রে বইতে লাগলো। তার প্রথম হামলাটা হানা দিতেই মরুভূমির নিঃসঙ্গতার মধ্যে জ্যোৎস্নার কংক্রিটে গড়া বিশাল প্রাসাদটার ভিৎশুদ্ধ কেঁপে উঠতে লাগলো। কিন্তু এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমা সেখানে তাঁদড় বন্য প্রকৃতির আচম্বিত ঝুঁকিগুলোতেই অভ্যস্ত ছিলো, সার-সার ময়ূর আর রোমক বাথটবের রঙিন কাচের ছেলেমানুষি ফালিতে সাজানো হামামটার মধ্যে দুজনের কেউই হাওয়ার কারদানিকে কোনো পাত্তাই দেয়নি।

মর্মরপাথরে তৈরি বাথটবটায় ন্যাংটো আর প্রকাণ্ড ঠাকুমাকে দেখাচ্ছিলো বিশাল এক অপরূপ শাদা তিমির মতো। এই সবে চোদ্দয় পড়েছে নাৎনি, কেমন যেন অবসাদে নেতিয়ে আছে সে, নিস্তেজ, তার অস্থিপঞ্জর এখনও নরম আর বয়সের তুলনায় সে ভারি ভদ্র আর বিনম্র। কেমন-একটা কুণ্ঠাকৃপণ ভঙ্গিতে, যার মধ্যে এক ধরনের ধর্মভীরু কঠোর সংযতভাব মেশানো, সে তার ঠাকুমাকে স্নান করাচ্ছে এমন জলে যা ফুটিয়ে নেয়া হয়েছে ওষধি আর সুগন্ধি লতাপাতায়, আর লতাপাতাগুলো লেপটে থাকছে ঠাকুমার শাঁসালো পিঠটায়, ধাতুরঙা খোলা এলো চুলে, আর তাঁর জমকালো কাঁধ দুটোয়, আর সেগুলো এমন ক্ষমাহীনভাবে উলকিদাগা যে খালাশিদেরও তা যেন লজ্জায় ফেলে দিতো।

'কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমি একটা চিঠির জন্যে হা ক'রে ব'সে আছি,' ঠাকুমা বললেন।

এরেন্দিরা—এড়িয়ে-যাওয়া নেহাৎই অসাধ্য না-হ'লে যে পারতপক্ষে কখনোই কথা বলে না—জিগেশ করলে :

'স্বপ্নের মধ্যে সেটা কী বার ছিলো?'

'বিয়্যুৎবার।'

'তাহ'লে খারাপ খবর ছিলো চিঠিটায়,' এরেন্দিরা বললে, 'তবে সেটা আর কোনোদিনই এসে পৌঁছুবে না।'

যখন সে তার ঠাকুমাকে স্নান করানো সারলে, এরেন্দিরা তাঁকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলো। ঠাকুমা মানুষটা এমনই বিপুলা যে হয় তাঁর নাৎনির কাঁধে ভর দিয়ে আর নয়তো বিশপের দোর্দণ্ডের মতো একটা লাঠির ওপর ভর রেখেই শুধু চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁর যাবতীয় দুঃসাধ্য চেষ্টা চালাবার সময়েও তাঁর নড়াচড়ায় এক অতীব-প্রত্ন কোনো মহিমার শক্তি প্রকাশ পায়। শোবার ঘরে গিয়ে—ঘরটা, পুরো বাড়িটার মতোই, কেমন যেন মাথা-ঘুরিয়ে-দেবার-মতো রুচির বড্ড বেশি-বেশি আশবাব দিয়ে ঠাশা—তার ঠাকুমাকে সাজিয়ে তৈরি ক'রে দিতে এরেন্দিরার দরকার হ'লো আরো দু-দুটি ঘণ্টা। গুছির পর গুছি খুলে-খুলে সে জট ছাড়ালে চুলের, তারপর গন্ধ ছিটিয়ে তা আঁচড়ে দিলে, নিরক্ষীয় ফুল-ফুল কাটা এক পোশাক চাপালে গায়ে, মুখে বুলিয়ে দিলে ট্যালকাম পাউডার, ঠোঁটে মাখালে উজ্জ্বল-লাল ওষ্ঠরঞ্জনী, গালে বোলালে লালিমা, চোখের পাতায় কস্তুরী, নখের ওপর মুক্তোর প্রলেপ, আর যখন সে তাঁকে সাজিয়ে তুললো যেন জীবন্ত প্রাণীর চেয়েও অতিকায় কোনো পুতুল, সে তাঁকে নিয়ে এলো দমআটকানো সব ফুলে ভরা গন্ধেঝিমঝিম এক কৃত্রিম বিতানে, ফুলগুলো যেখানে তাঁর পোশাকের ফুলগুলোর মতোই নিরক্ষীয়; এনে তাঁকে বসালে মস্ত এক চেয়ারে যার ভিৎ আর বংশপরিচয় কোনো সিংহাসনের মতো, আর তাঁকে সে সেখানে রেখে এলো উৎকর্ণ, কান পেতে শুনছেন সব হারিয়ে-যাওয়া রেকর্ড এমন-এক ফোনোগ্রাফে বাজছে, যার স্পীকারটা ঠিক যেন মস্ত এক চোঙা, যেন একটা মেগাফোন।

...

দিদিমা যখন ভেসে চলেছেন অতীতের সব জলায়, এরেন্দিরা নিজেকে ব্যস্ত রাখলে বাড়িটা ঝাঁট দিতে; বাড়িটা অন্ধকার আর রংচঙে, উদ্ভট আর আজব সব আশবাব আর উদ্ভাবিত সব কায়েসারদের মূর্তিতে ঠাশা; তেলস্ফটিকের দেবদূত আর অশ্রুস্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠন, সোনা-রং-করা এক পিয়ানো, আর অভাবনীয় সব আকার ও রূপের অগুনতি ঘড়ি। উঠোনে আছে মস্ত এক ঢাকা চৌবাচ্চা, জল জমিয়ে রাখবার জন্যে—দূর-দূর ঝরনা থেকে ইণ্ডিয়ানদের পিঠে-পিঠে অনেক বছর ধ'রে এসেছে এ-জল; আর চৌবাচ্চার দেয়ালের গায়ে একটা আংটায় বাঁধা এক ভাঙাচোরা উটপাখি—সে-ই একমাত্র পাখাওলা জীব যে এই অভিশপ্ত আবহাওয়ার নিত্যযন্ত্রণায় টিকে থাকতে পেরেছে। সবকিছু থেকেই অনেক, অনেক দূরে এই বাড়িটা, মরুভূমির ঠিক বুকের ওপর, এমন-একটা বসতির পাশে যার রাস্তাগুলো সব ভারি-দুঃস্থ আর আগুনজ্বলা যেখানে ছাগলেরা দল বেঁধে আত্মহত্যা করে যখন

দুর্ভাগ্যের হাওয়া বইতে থাকে শনশন, তোড়ে, আর ছাগলদের বেজায় মন খারাপ হ'য়ে যায়।

এই দুর্জ্ঞেয় আশ্রয়টি গ'ড়ে ছিলেন ঠাকুমার স্বামী, এক চোরাচালানকারী যাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছিলো অতিকথা আর কিংবদন্তি, যাঁর নাম ছিলো আমাদিস; তাঁরই মারফৎ ঠাকুমার এক ছেলে হয়েছিলো যারও নাম ছিলো আমাদিস, যে ছিলো এরেন্দিরার বাবা। এই পরিবারের উৎসই বা কী আর অভিপ্রায়ই বা কী, তা কেউ জানতো না। ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় সবসেরা যে-সংস্করণটি পাওয়া যায় তা এই: পিতা আমাদিস নাকি আন্তিইয়ের এক গণিকালয় থেকেই তাঁর রূপসী স্ত্রীকে উদ্ধার ক'রে এনেছিলেন, সেখানে ছুরির চকমকিতে তিনি খুন করেছিলেন কাকে যেন, তারপর স্ত্রীকে এনে তিনি রোপণ করেছিলেন মরুভূমির ঝুঁকিবিরহিত শান্তির মাঝখানে। আমাদিসরা যখন ম'রে গেলো—একজন মরলো বিমর্ষ জ্বরে-তাপে আর অন্যজন একটি মেয়েকে নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে গুলিতে-গুলিতে ঝাঁঝরা হ'য়ে—ঠাকুমা তাদের মৃতদেহগুলো কবর দিয়েছিলেন উঠোনে, তাড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন চোদ্দজন খালি-পা তরুণী দাসী; আর সেই চোরা-উকি-মারা বাড়ির ছায়ায় জমকালো সব মহিমার স্বপ্নেই বিভোর হ'য়ে জাবর কাটতে লাগলেন তারপর, বেজন্মা নাৎনিটির যাবতীয় ত্যাগের সৌজন্যে—তাকে তিনি নিজেই জন্ম থেকে লালন করেছেন।

শুধু দম দিয়ে-দিয়ে ঘড়িগুলোর কাঁটা ঠিক সময়ে এনে বসাতে ছ-ঘণ্টা লাগতো এরেন্দিরার। তার দুর্ভাগ্য যেদিন শুরু হ'লো সেদিন তাকে তা করতে হয়নি কারণ পরদিন সকাল অব্দি চলবার মতো যথেষ্ট দম ছিলো ঘড়িগুলোর, কিন্তু, অন্যদিকে আবার, তাকে স্নান করাতে হয়েছিলো ঠাকুমাকে, বিস্তর পোশাক পরিয়ে সাজাতে হয়েছিলো, মুছতে হয়েছিলো মেঝে, পাকাতে হয়েছিলো দুপুরের খানা, ঘ'ষে-মেজে ঝকঝকে ক'রে দিতে হয়েছিলো স্ফটিকের বাসনকোশন। এগারোটা নাগাদ, যখন সে উটপাখির বাটিটার জল পালটে দিচ্ছে আর আমাদিসদের যুগল কবরের ওপর গজানো মরুভূমির কাঁটাঝোপে জল দিচ্ছে, তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছিলো বাতাসের রোষের বিরুদ্ধে: ততক্ষণে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে হাওয়া, তবু সে তখনও ঘৃণাক্ষরেও টের পায়নি যে এ তারই দুর্ভাগ্যের হাওয়া শন-শন ক'রে বইছে। বেলা বারোটায় সে যখন শ্যামপেনের শেষ গেলাশগুলো মুছছে তখন তার নাকে এলো শুরুয়ার সুঘ্রাণ আর তাকে, পেছনে ভিনিসীয় কাচের ঝনঝনে ধ্বংসস্তূপ না-রেখেই, রান্নাঘরে ছুটে যাবার মতো অলৌকিক কীর্তিটা করতে হ'লো।

উথলে উপচে পড়ার আগেই ডেকচিটা কোনোক্রমে সে উনুন থেকে নামাতে পেরেছিলো। তারপর সে উনুনে চাপালে একটা স্টু যেটা সে আগেই তৈরি ক'রে রেখেছিলো আর এই ফাঁকে সে সুযোগ পেয়েছিলো রান্নাঘরের একটা চৌকির ওপর ব'সে একটু জিরিয়ে নেবার। দু-চোখ মুদেছিলো সে, আবার খুলে ফেলেছিলো, অবসাদের এক অভিব্যক্তি সমেত, তারপর শুরুয়া ঢালতে শুরু করেছিলো স্যুপের বড়ো ঢাকাওলা বাটিটায়। ঘুমোতে-ঘুমোতেই কাজ করছিলো এরেন্দিরা।

ভোজটেবিলের মাথাটায় ঠাকুমাই বসেছিলেন একা-একা, যদিও রুপোর শামাদানে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিলো বারোজন লোকের কথা ভেবে। তিনি তাঁর ছোট্ট ঘুন্টিটা বাজালেন আর প্রায় তক্ষুনি এরেন্দিরা এসে পৌঁছুলো ধোঁয়া-ওঠা স্যুপের বাটি নিয়ে। এরেন্দিরা যখন তাঁর বাটিতে স্যুপ ঢালছে ঠাকুমা তার ঘুমের ঘোরে কাজ করার ভঙ্গিটা খেয়াল করলেন আর নিজের হাতটা তার চোখের সামনে নড়ালেন যেন কোনো অদৃশ্য কাচের পাল্লা মুছছেন এমনভাবে। কিশোরী হাতটা দেখতেই পায়নি। ঠাকুমা চোখে-চোখেই তাকে অনুসরণ করলেন আর তারপর যখন এরেন্দিরা রান্নাঘরে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরেছে, তিনি তাকে উদ্দেশ ক'রে হাঁক পাড়লেন :

'এরেন্দিরা!'

আচমকা জেগে গিয়ে কিশোরী স্যুপের বাটিটা হাত থেকে মেঝের ফরাশের ওপর ফেলে দিলে।

'ও ঠিক আছে, বাছা,' মমতা প্রকাশ ক'রে ঠাকুমা তাকে বললেন। 'আবারও তুই হাঁটতে-হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি!'

'আমার শরীরটার ও-রকম একটা অভ্যেস আছে,' কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বললে এরেন্দিরা।

তখনও সবকিছু ঘুমে আবছা, এরেন্দিরা স্যুপের বাটি তুলে নিয়ে ফরাশ থেকে দাগটা সাফ করবার চেষ্টা করলে।

'ছেড়ে দে এখন,' ঠাকুমা তাকে বিরত হ'তে পরামর্শ দিলেন। 'বিকেলেই না-হয় এটা তুই ধুয়ে নিস।'

ফলে তার নিয়মিত বৈকালী কাজকর্মের সঙ্গে-সঙ্গে এরেন্দিরাকে খাবারঘরের ফরাশটাও ধুতে হ'লো, আর ধোবার গামলার কাছেই যখন এসে পড়েছে তখন সে সোমবারের ধোয়াধুয়ির কাজটাও সেরে নিলে, আর সারাক্ষণ হাওয়া বাড়িটাকে ঘিরে হা-হা হা-হা করলো, ভেতরে ঢোকবার একটা পথ হাৎড়ে। তাকে এত-

সমস্ত কাজ করতে হ'লো যে সে কিছু বুঝে-ওঠবার আগেই রাত্তির এসে চড়াও হ'লো, আর যখন সে খাবার ঘরের ফরাশটা আবার সবে পেতেছে, তখনই এসে হাজির শোবার সময়।

সারা বিকেল ধ'রে ঠাকুমা পিয়ানোয় ব'সে খেলা করছিলেন, রিনরিনে নকল গলায় গাইছিলেন তাঁর আমলের সব গান, আর চোখের পাতায় লেগেছিলো অশ্রু আর কস্তুরীর দাগ। কিন্তু যখন তিনি মশলিনের রাতকাপড় প'রে তাঁর বিছানায় শুলেন সুখস্মৃতির তিক্ততারা সদলবলে ফিরে এলো।

'কালকে সুযোগ ক'রে বসার ঘরের ফরাশটাও ধুয়ে নিস,' তিনি বললেন এরেন্দিরাকে। 'শোরগোলের সব দিনগুলোর পর এটা একদিনও আর রোদের মুখ ছাখেনি।'

'সি, আবুয়েলা,' কিশোরী উত্তর দিলে।

তার অপ্রশম্য কর্ত্রীঠাকরুনকে হাওয়া করবার জন্যে সে একটা পালকের পাখা তুলে নিলে, আর তিনি ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতে আউড়ে গেলেন নৈশ হুকুমের ফর্দটা।

'শুতে যাবার আগে সব কাপড়চোপড় ইস্ত্রি ক'রে নিস, তাহ'লেই তুই বিবেকের তাড়না ছাড়াই ঘুমোতে পারবি।'

'সি, আবুয়েলা।'

'কাপড় রাখার চোরকুঠুরিগুলো ভালো ক'রে দেখে নিবি, কারণ পোকাগুলো ঝোড়ো হাওয়ার রাতেই খিদেয় হন্যে হ'য়ে যায়।'

'সি, আবুয়েলা।'

'তারপর হাতে যে-সময় থাকবে সেই ফাঁকে ফুলগুলো উঠোনে নিয়ে যাবি যাতে তারা টাটকা হাওয়ায় দম নিতে পারে।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর উটপাখিটাকে খাইয়ে দিবি।'

ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু তবু হুকুমগুলো দিয়েই চলেছেন পর-পর, কারণ তাঁর নাৎনি তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পেয়েছে ঘুমোতে-ঘুমোতে বেঁচে থাকার। এরেন্দিরা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, এক-এক ক'রে রাতের কাজ হাতের কাজ সারলো, তখনও সে ঘুমন্ত ঠাকুমার হুকুমগুলোর উত্তর দিয়ে চলেছে।

'কবরগুলোয় একটু জল দিবি।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর আমাদিসেরা যদি এসে হাজির হয়, ওদের ব'লে দিবি ভেতরে যেন না-ঢোকে,' ঠাকুমা বললেন, 'কারণ পোরফিরিও গালানের দলবল ওদের খুন করবার জন্যে ওৎ পেতে আছে।'

এরেন্দিরা তাঁকে আর-কোনো উত্তর দিলে না, কারণ সে বুঝে গিয়েছে তার ঠাকুমা এতক্ষণে তাঁর প্রলাপে-বিকারে হারিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সে তাঁর একটিও হুকুম অমান্য করেনি। জানলার খিলগুলো লাগানো আছে কি না এক-এক ক'রে দেখে নিয়ে, শেষ আলোগুলো পর-পর নিভিয়ে দেবার পর সে খাবার ঘর থেকে একটা মোমবাতি তুলে নিয়ে আলো ফেলে-ফেলে চ'লে এলো তার নিজের শোবার ঘরে; হাওয়ার উৎপাত মাঝে-মাঝে যখন থামে তখন তার ঘুমন্ত ঠাকুমার শান্ত ও বিশাল নিশ্বাসের শব্দে বাড়িটা ভ'রে যায়।

তার নিজের ঘরটাও বিলাসবৈভবে ভরা তবে ঠাকুমার ঘরটার মতো অত নয়, আর রাশি-রাশি ন্যাকড়ার পুতুল আর দম-দেয়া সব জীবজন্তুতে বোঝাই ঘরটা তার সদ্যসমাপ্ত শৈশবেরই স্মরণচিহ্ন। দিনের ফুরসৎহীন বর্বর খাটাখাটুনিতে বিধ্বস্ত, এরেন্দিরার সেই শক্তিটুকুও আর ছিলো না যে পোশাক খোলে কিংবা শামাদানটিকে রাখে রাতচৌকিতে: সে ধপ ক'রে প'ড়ে গেলো বিছানায়। একটু পরেই তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া সশরীরে তার শোবার ঘরে এসে হাজির হ'লো একদল খ্যাপা ডালকুত্তোর মতো আর মোমবাতিটাকে উলটে দিলে পর্দার গায়ে।

...

ভোরবেলায় বাতাস যখন অবশেষে থামলো, কয়েকটা ভারি-ভারি বৃষ্টির ফোঁটা পড়লো এদিক-ওদিক, নিভিয়ে দিলো শেষ অঙ্গারগুলো, আর প্রাসাদটির ধূমায়িত ভস্মকে শক্ত ও জমাট ক'রে তুললো। গাঁয়ের লোকে—বেশির ভাগই তারা ইণ্ডিয়ান—চেষ্টা করেছিলো অগ্নিকাণ্ড থেকে যা বেঁচেছে উদ্ধার করতে: উটপাখির দগ্ধীভূত মৃতদেহ, সোনায় মোড়া পিয়ানোর কাঠামো, একটা কবন্ধ ও অঙ্গহীন পাথরমূর্তি। দুর্ভেদ্য এক মনখারাপের ঘোরে ঠাকুমা তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবছিলেন তাঁর এত ঐশ্বর্যের এখন কীই বা আর অবশিষ্ট আছে। এরেন্দিরা—দুই আমাদিসের কবরের মাঝখানে ব'সে—এতক্ষণে শেষ করেছে তার কান্না। ঠাকুমা যখন শেষ অব্দি বিশ্বাস করলেন যে এই তাণ্ডবের মধ্যে খুবই কম জিনিশ আছে আস্ত ও অবিকৃত, তিনি সত্যিকার দয়ায় ভ'রে গিয়ে তাঁর নাৎনির দিকে তাকালেন।

'বেচারা,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঠাকুমা। 'এই দুর্ঘটনায় গচ্চা যাওয়া সবকিছুর দাম ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তোর সারা জীবনটাও যথেষ্ট দীর্ঘ হবে না।'

সেদিন থেকেই এরেন্দিরা বকেয়া চুকিয়ে দিতে শুরু করলে; শুরু করলে বৃষ্টির কোলাহলের তলায়, যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো গাঁয়ের মুদির দোকানটার মালিকের কাছে, সে এক শুঁটকো অপরিণত বিপত্নীক, কুমারীত্বের জন্যে ভালো দাম দেয় ব'লে মরুভূমিতে যার নাম সব্বাই জানে। বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না-গিয়ে ঠাকুমা যখন অপেক্ষা করছেন, বিপত্নীকটি বৈজ্ঞানিকের মতো নিরাসক্ত নিস্পৃহ কঠোর চোখে এরেন্দিরাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলে: সে আন্দাজ ক'রে নিলে তার উরু দুটোর শক্তি, তার স্তনের আকার, তার নিতম্বের ব্যাস। তার দাম কী হবে সেটা মনে-মনে হিশেব না-ক'রে, সে একটাও কথা বললে না।

'এখনও বড্ড কচি আছে,' সে বললে তার পরে। 'চুঁচি দুটো তো ঠিক কুত্তির মতো।'

তারপর মুদিয়ালি এরেন্দিরার মাপজোক হিশেব-টিশেব প্রমাণ করবার জন্যে তাকে চড়ালে দাঁড়িপাল্লায়। এরেন্দিরার ওজন নব্বুই পাউণ্ড।

'বড়ো জোর একশো পেসো, তার চাইতে এর দাম মোটেও বেশি নয়,' বললে বিপত্নীকটি।

কেলেঙ্কারি দেখে আঁৎকে উঠলেন ঠাকুমা।

'একেবারে আনকোরা কোনো ছুঁড়ির জন্যে কুললে একশো পেসো!' প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন ঠাকুমা। 'না, সেনিওর, তাতে বোঝা যায় যৌন শুদ্ধতার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার অভাবটা শোচনীয় ও বিষম।'

'আমি দেড়শো পর্যন্ত উঠতে পারি,' বিপত্নীক বললে।

'এই মেয়ে আমার যা লোকশান করেছে তা দশ লক্ষ পেসোরও বেশি,' ঠাকুমা বললেন। 'এই হারে চললে আমার সব টাকা শুধে দিতে ওর দুশো বছর লাগবে।'

'আপনার বরাৎ ভালো যে ওর গুণ বলতে একটাই জিনিশ আছে—সে হ'লো ওর বয়েস,' বিপত্নীক বললে।

তুফান বাড়িটাকে উপড়ে ফেলবে ব'লেই ভয় দেখালে, আর ছাতে এতই ফুটোফোকর যে বাইরে যত ভেতরেও প্রায় ততটাই বৃষ্টি পড়ছে। ঠাকুমার মনে হ'লো সর্বনাশের এই জগতে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়েছেন।

'অন্তত তিনশো অব্দি বাড়ান,' ঠাকুমা বললেন।

'আড়াইশো।'

শেষটায় তাঁদের রফা হ'লো নগদ দুশো কুড়ি পেসোয় আর বাকি দাম

মেটানো হবে খাবারদাবারে। ঠাকুমা তখন এরেন্দিরাকে ইঙ্গিত করলেন বিপত্নীকের সঙ্গে যেতে, আর মৃদিয়ালি তার হাত ধ'রে তাকে পেছনের ঘরে নিয়ে গেলো—যেন সে তাকে নিয়ে পাঠশালায় যাচ্ছে।

'আমি তোর জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবো,' ঠাকুমা বললেন।

'সি, আবুয়েলা,' বললে এরেন্দিরা।

পেছনের ঘর, অর্থাৎ একটা চালা ঘর, ইটের তৈরি চারটে থাম, পচা হাজা তালপাতার ছাউনি, তিন ফুট উঁচু একটা আদোবে [পোড়ামাটির] দেয়াল, যার ভেতর দিয়ে বাইরের যাবতীয় গণ্ডগোল দালানটার মধ্যে গিয়ে ঢোকে। আদোবে পাঁচিলের ওপরে নানারকম হাঁড়ি-পাতিলে ফণিমনসা আর অন্যান্য রুক্ষ-মাটির উদ্ভিদ বসানো। দুটো থামের মাঝখান থেকে ঝুলছে, কোনো হু-হু ভেসে-যাওয়া ডিঙির খোলা পালের মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে, একটা বিবর্ণ রংচটা দোলখাটিয়া। ঝড়ের শিস আর জলের ঝাপটা ছাপিয়ে কেউ শুনতে পেতো দূরের সব চীৎকার, কোথাও অনেক দূর থেকে গর্জন করছে বুনো জানোয়ার, কোথাও-বা উঠছে নৌকাডুবির আর্তনাদ।

এরেন্দিরা আর বিপত্নীকটি যখন চালাটার মধ্যে এসে ঢুকেছিলো তাদের আঁকড়ে ধরতে হয়েছিলো পরস্পরকে, বৃষ্টির দমকা যে-ঝাপটা তাদের সপসপে ভিজিয়ে চ'লে যাচ্ছে সেটা যাতে তাদের মাটিতে আছড়ে না-ফ্যালে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছিলো না বটে কিন্তু তুফানের গরগর ছাপিয়ে স্পষ্ট শুনতে পারা যাচ্ছিলো তাদের নড়াচড়ার আওয়াজ। বিপত্নীকের প্রথম চেষ্টায় এরেন্দিরা কী-একটা চেঁচিয়ে উঠেছিলো অস্ফুট, চেষ্টা করেছিলো স'রে যেতে। বিপত্নীক তাকে উত্তর দিয়েছিলো কোনো কণ্ঠস্বর বিনাই, কব্জিটা ধ'রে মুচড়ে দিয়েছিলো হাত, হিঁচড়ে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো দোলখাটিয়ায়। এরেন্দিরা রীতিমতো যুঝেছিলো তার সঙ্গে, আঁচড়ে দিয়েছিলো তার মুখ। আবার চেঁচিয়ে উঠেছিলো ঘনজমাট স্তব্ধতায়, কিন্তু বিপত্নীক তাকে ঠাশ ক'রে এমন-একটা চড় মেরেছিলো যে একচড়েই সে মাটি থেকে শূন্যে উঠে গিয়েছিলো, শূন্যেই সে ঝুলে ছিলো এক ঝলক, আর তার দীর্ঘ মেড়ুসা চুল উড়ছিলো শূন্যে। সে আবার মাটিতে নেমে আসার আগেই বিপত্নীক আঁকড়ে ধরেছিলো তার কোমর, পাশবিক এক ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিলো দোলখাটিয়ায়, আর হাঁটু দিয়ে তাকে চেপে ধ'রে রেখেছিলো। এরেন্দিরা, আতঙ্কে, তলিয়ে গিয়েছিলো কোন্-এক বিভীষিকায়, হারিয়ে ফেলেছিলো তার সংজ্ঞা, আর তেমনিই থেকে গিয়েছিলো সারাক্ষণ যেন

হা ক'রে সম্মোহিত দেখছিলো একটা মাছের গা থেকে ঝ'রে-পড়া জ্যোৎস্না—যে-মাছটা উড়ে যাচ্ছে তুফানের হাওয়ায়; আর সেই ফাঁকে বিপত্নীক নিরাবরণ ক'রে দিয়েছিলো তাকে, অভ্যস্ত ব্যবস্থাপক থাবায় প্রায় হ্যাঁচকা টানেই ছিঁড়ে এনেছিলো তার পোশাক, যেন সে মাটি থেকে ঘাস ওপড়াচ্ছে চাপড়া-চাপড়া, আর তাদের সে ছড়িয়ে দিয়েছিলো চাপ-চাপ রঙের ডেলার মতো, যা ঢেউখেলানো রঙিন কাগজের মতো নেচে-নেচে উড়ে যাচ্ছিলো—হাওয়ার সঙ্গে যা শেষে উড়ে চ'লে গিয়েছিলো।

এরেন্দিরার প্রণয়ের জন্য দাম দিতে পারে, গাঁয়ে যখন এমন আর-কোনো পুরুষ বাকি রইলো না তার ঠাকুমা তাকে একটা ট্রাকে চাপালেন, যেখানে চোরাচালানকারীরা থাকে সেখানে যাবার জন্যে। তারা সফরটায় বেরুলো খোলা ট্রাকের পেছনটায়; বস্তা-বস্তা চাল আর বালতি-বালতি তেল-ঘি, এবং আগুনের খিদে থেকে যা বাঁচানো গেছে সব সম্পত্তি নিয়ে: লাটসায়েবের বিছানার শিয়রের কাঠ, এক যুদ্ধরত অকুতোভয় দেবদূত, পোড়া সিংহাসন এবং আরো-সব অদরকারি বাতিল জঞ্জালের সঙ্গে। মোটা-মোটা তুলির টানে দুটি ক্রুশ-আঁকা একটা তোরঙ্গে তারা ব'য়ে নিয়ে গেলো আমাদিসদের হাড়গোড়।

একটা ছেঁড়া ছাতা মাথার ওপর মেলে দিয়ে ঠাকুমা নিজেকে বাঁচাতে চাচ্ছিলেন রোদ্দুর থেকে, ধুলো আর ঘামের অত্যাচারে অতিষ্ঠ তাঁর পক্ষে দম নেয়াটাই ভারি কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো, কিন্তু এমন যা-দশাতেও তিনি তাঁর মেজাজ-মর্যাদার ওপর পুরো দখল রেখেছিলেন। স্তূপ-ক'রে-রাখা কৌটো আর চালের বস্তার আড়ালে এরেন্দিরাকে সফরের রাহাখরচ আর মালপত্তর নেবার মাশুল জোগাতে হ'লো ট্রাকের মাল ওঠায়-নামায় যে-লোকটা তার সঙ্গে প্রতি দফা কুড়ি পেসো হারে প্রেম ক'রে। গোড়ায় এরেন্দিরার আত্মরক্ষার উপায় ছিলো বিপত্নীকের হামলাকে সে যেভাবে সামলাবার চেষ্টা করেছিলো সেই প্রতিরোধব্যবস্থাই, কিন্তু ট্রাকের খালাশির কায়দাটা ছিলো অন্যরকম, ধীরমন্থর ও প্রজ্ঞায় পণ্ডিত, আর শেষটায় সে তাকে পোষ মানালে মমতায় আর কোমলতায়। ফলে মারাত্মক সফরটার পরে তারা যখন গিয়ে প্রথম শহরটায় পৌঁছুলো, এরেন্দিরা আর ট্রাকের খালাশি তখন মালপত্তরের আড়ালে অতীব তৃপ্তিকর রতিক্রিয়ার পরে সুখে ও আয়েশে এলিয়ে প'ড়ে ছিলো। ট্রাকচালক চেঁচিয়ে ঠাকুমাকে বললে:

'এইখান থেকেই জগতের শুরু।'

ঠাকুমা অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন শহরটার হতশ্রী আর নির্জন

রাস্তাঘাট : আগের শহরের চাইতে এটা একটু বড়ো বটে, তবে যে-শহরটা ছেড়ে এসেছেন তারই মতো এটাও দুঃস্থ দুঃখী ও করুণ।

'দেখে তো আমার তা মনে হচ্ছে না,' ঠাকুমা বললেন।

'এটা চার্চের আশ্রমের পত্তনি,' ট্রাকচালক জানালে।

'দয়াদাক্ষিণ্য দানধ্যানে আমার আগ্রহ নেই, আমি চাই চোরাচালানকারীদের,' বললেন ঠাকুমা।

মালের বস্তাগুলোর আড়াল থেকে এই দ্বৈতালাপ শুনতে-শুনতে এরেন্দিরা অন্যমনস্কভাবে একটা বস্তাকে খুঁটছিলো—শেষটায় আঙুল দিয়ে সে একটা চালের বস্তা ফুটো ক'রে দিলে। হঠাৎ সে দেখতে পেলে ভেতর থেকে একটা সুতো বেরিয়ে আছে, সেটাকে ধ'রে টান দিতেই বেরিয়ে এলো খাঁটি মুক্তোর একটা হার। স্তম্ভিত হ'য়ে সে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো, হারটাকে সে আঙুলের ফাঁকে এমনভাবে ধ'রে আছে যেন সেটা একটা মরা সাপ; এদিকে ট্রাকচালক তখন ঠাকুমাকে বলছে :

'দিবাস্বপ্ন দেখবেন না, সেনিওরা। চোরাচালানকারী ব'লে কিছু নেই।'

'মোটেই না,' ঠাকুমা বললেন। 'তোমার নিজের জবানই আছে আমার।'

'দেখুন চেষ্টা ক'রে কাউকে পান কি না, তাহ'লেই টের পাবেন।' ট্রাকচালক একটু ইয়াকি করলে। 'সকলেই তাদের কথা বলে, কিন্তু কেউই নাকি চর্মচক্ষুতে কখনও কাউকে দ্যাখেনি।'

ট্রাকের খালাশিটি টের পেলে যে এরেন্দিরা হারটা টেনে বার ক'রে এনেছে; সে চট ক'রে সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবারও চালের বস্তায় ঢুকিয়ে রাখলে। শহরের এই দুঃস্থ দশা সত্ত্বেও, বিষম দারিদ্র্য সত্ত্বেও, ঠাকুমা স্থির করেছেন এখানেই থাকবেন; নাৎনিকে ডেকে বললেন ট্রাক থেকে নামতে তাঁকে সাহায্য করতে। এরেন্দিরা খালাশিকে বিদায় জানালে চুমু খেয়ে, চুমুটা একটু তাড়া ক'রেই খেতে হ'লো, তবে সেটা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত আর আন্তরিক।

ঠাকুমা, রাস্তার ওপরে তাঁর সিংহাসনে ব'সেই, অপেক্ষা ক'রে রইলেন কতক্ষণে তারা মালপত্তর নামানো শেষ করে। শেষ যেটা নামানো হ'লো সেটা আমাদিসদের হাড়গোড়ে ভরা তোরঙ্গটা।

'এর ওজন তো দেখছি একটা লাশের মতো,' ট্রাকচালক রগড় ক'রে হেসে বললে।

'একটা নয়, দুটো,' ঠাকুমা বললেন, 'কাজেই যথাযোগ্য সম্মান কোরো ওদের।'

'বাজি ধ'রে বলতে পারি এরা সব মর্মরমূর্তি,' ট্রাকচালক আবারও দাঁত বার করলে।

হাড়গোড়ওলা তোরঙ্গটা সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পুড়ে-যাওয়া আশবাবপত্রের মধ্যে নামিয়ে রেখে দিদিমার কাছে হাত পাতলে।

বললে, 'পঞ্চাশ পেসো।'

'তোমার গোলামটা এর মধ্যেই সব দক্ষিণ হস্তে পেয়ে গেছে।'

ট্রাকচালক অবাক হ'য়ে তার সহকারী খালাশিটির দিকে তাকাতেই সে সম্মতিসূচক একটা ইঙ্গিত করলে। ট্রাকচালক তখন ফিরে চ'লে গেলো তার চালকের খোপে, যেখানে ব'সে ভ্রমণ করছিলো এক মেয়ে, শোকপোশাক গায়ে, কোলে একটা বাচ্চা—বাচ্চাটি গরমে অতিষ্ঠ হ'য়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। ট্রাকের খালাশি—নিজের সম্বন্ধে সে দিব্যি নিঃসংশয়—ঠাকুমাকে বললে :

'এরেন্দিরা আমার সঙ্গে আসছে—অবশ্য আপনার যদি কোনো আপত্তি না-থাকে।'

কিশোরী চমকে উঠে মাঝখানে প'ড়ে বললে :

'আমি কিন্তু কিছু বলিনি!'

'ভাবনাটা একেবারেই আমার, পুরোপুরি,' খালাশিটি বললে।

ঠাকুমা তার আগাপাছতলা নিরীক্ষণ করলেন, সেটা এজন্যে নয় যে ঐ চাউনির সামনে সে যেন কুঁকড়ে গুটিয়ে একরত্তি হ'য়ে যায়, বরং তার সাহসের পরিমাণটিই তিনি আন্দাজ করতে চাচ্ছিলেন।

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' বললেন ঠাকুমা, 'যদি ওর অবহেলায় আমি যা-কিছু হারিয়েছি সব তুমি আমাকে পুষিয়ে দাও। সবশুদ্ধ আটশো বাহাত্তর হাজার তিনশো পেসো, তা থেকে বাদ যাবে চারশো বিশ, যা সে নিজেই এর মধ্যেই আমাকে শোধ ক'রে দিয়েছে। তাহ'লে দাঁড়ালো আটশো একাত্তর হাজার আটশো পঁচানব্বুই।'

ট্রাকের এনজিন জেগে উঠলো।

'বিশ্বাস করুন, আমার কাছে অত টাকা থাকলে সব আমি দিয়ে দিতুম,' খালাশি গম্ভীরভাবে বললে। 'মেয়েটি দামি।'

ছোকরার সিদ্ধান্ত শুনে দিদিমা বেশ খুশিই হলেন।

'বেশ, তাহ'লে, বাছা, তোমার যখন টাকা হবে ফিরে এসো,' সহানুভূতির সুরে উত্তর দিলেন ঠাকুমা। 'তবে এখন তুমি বরং কেটে পড়ো, কারণ আবার

যদি হিশেব মেলাতে বসি তবে হয়তো দেখা যাবে তুমি আমার কাছে দশ পেসো ধারো।'

খালাশি লাফিয়ে উঠলো ট্রাকের পেছনটায় আর অমনি ট্রাকটা ছেড়ে দিলে। ট্রাকের ওপর থেকেই হাত নেড়ে সে বিদায় জানালে এরেন্দিরাকে, কিন্তু সে-বেচারা এতটাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো যে সে কোনোই সাড়া দেয়নি।

যে-ফাঁকা জায়গাটায় ট্রাক তাদের নামিয়ে দিয়েছিলো, এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমা ঠিক সেখানেই দস্তার পাত আর প্রাচী-র ফরাশের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে কোনো-ক্রমে মাথা গোঁজবার একটা আশ্রয় উদ্ভাবন ক'রে নিলে। দুটো জাজিম পাতলে তারা মাটিতে আর প্রাসাদে থাকবার সময় যেমন ঘুমুতো তেমনি ভালো ঘুম হ'লো তাদের যতক্ষণ-না রোদ্দুর এসে ফুটো করলে ছাতে আর পুড়িয়ে দিলে তাদের মুখ-চোখ।

সাধারণত যেমন হয় এবার তার উলটোটাই হ'লো: এবার ঠাকুমাই এরেন্দিরাকে সাজাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। এরেন্দিরার মুখটি তিনি এমনভাবে সাজালেন যেন কোনো সুন্দরী এসেছে কারু অন্ত্যেষ্টিতে, শ্রাদ্ধবাসরে; ঠাকুমার যৌবনে এমনিতর রূপেরই চলন ছিলো; তার আঙুলে পরিয়ে দিলেন নকল নখ, আর পাৎলা মশলিনের এক ফিতে এমনভাবে বেঁধে দিলেন মাথায় যে দেখে মনে হ'লো মাথায় যেন এক প্রজাপতি ব'সে আছে।

'বিশ্রী দেখাচ্ছে তোকে,' দিদিমা কবুল করলেন, 'তবে এভাবেই ভালো: মেয়েদের বেলায় পুরুষগুলো একেবারেই হাঁদা হ'য়ে যায়।'

চোখে দেখবার বেশ খানিকক্ষণ আগেই তাঁরা শনাক্ত করতে পারলেন মরুভূমির চকমকি পাথরের ওপর দুটি খচ্চরের চলার শব্দ। ঠাকুমার হুকুমে এরেন্দিরা এমন-ভাবে জাজিমের ওপর শুয়ে পড়লো যেন কোনো অপেশাদার অভিনেত্রী পর্দা ওঠবার ঠিক আগটায় শুয়ে আছে। যাজকের দোর্দণ্ডটার ওপর ভর দিয়ে ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন আশ্রয় থেকে, এসে বসলেন তাঁর সিংহাসনে, খচ্চররা কখন এখান দিয়ে যায় তারই অপেক্ষায়।

আসছিলো ডাকহরকরা। তার বয়েস সদ্য কুড়ি পেরিয়েছে, কিন্তু তার জীবিকা তাকে এর মধ্যেই বুড়িয়ে ফেলেছে; সে প'রে আছে খাকির উর্দি, পায়ে ফিতের মোজা, মাথায় শোলার টুপি, আর তার কার্তুজের কোমরবন্ধের সঙ্গে রয়েছে একটা সামরিক পিস্তল। ভালো একটা খচ্চরের ওপর চ'ড়ে চলেছে সে, অন্যটাকে লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—অন্য খচ্চরটা আরো-অনেক সময়জীর্ণ, তার ওপরেই স্তূপ ক'রে রাখা আছে ডাকের বস্তাগুলো।

ঠাকুমার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একটা সেলাম ঠুকলো বটে, তবে থামলো না—চলতেই থাকলো; কিন্তু ঠাকুমা তাকে ইশারায় বললেন আশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে দেখতে। লোকটা থামলো; দেখতে পেলে এরেন্দিরা তার মরণোত্তর প্রসাধনে সেজে জাজিমের ওপর শুয়ে আছে, গায়ে তার বেগনিলাল আঁচল দেয়া ঘাঘরা।

'কী? পছন্দ হয়?' ঠাকুমা জিগেশ করলেন।

প্রস্তাবটা যে সত্যি কী, এ-কথার আগে অব্দি ডাকহরকরা তা বুঝতেই পারেনি।

'কাউকে যদি নিছক রুগীর পথ্যি খেয়ে থাকতে হয়, তবে এ তার খারাপ লাগবে কেন?' ডাকহরকরা মুচকি হেসে বললে।

'পঞ্চাশ পেসো,' ঠাকুমা বললেন।

'বাব্বা, তুমি দেখছি আস্ত তোষাখানাই চাচ্ছো!' সে বললে, 'ও-টাকায় আমি সারা মাস পেট পুরে খেতে পারবো।'

'কঞ্জুশি কোরো না,' ঠাকুমা বললেন। 'হাওয়াই ডাক কোনো চার্চের পুরুতের চাইতে বেশি পয়সা দেয়।'

'আমি অন্তর্দেশীয় বিলি করি—দিশি ডাক,' লোকটা বললে, 'হাওয়াই ডাক যে বিলি করে সে টাকে ক'রে যায়।'

'সে যা-ই হোক, প্রেমও খাওয়ার মতোই জরুরি কাজ,' ঠাকুমা বললেন।

'হ্যাঁ, তবে সে তো আর তোমার পেট ভরায় না।'

ঠাকুমা সমঝে গেলেন অন্য লোকেরা যার অপেক্ষায় হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকে তা যে বিলি ক'রে বেড়ায় তার হাতে দরদস্তুর করার জন্যে অঢেল সময় আছে।

'কত আছে তবে তোমার কাছে?' ঠাকুমা তাকে জিগেশ করলেন।

ডাকহরকরা খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পকেট থেকে কিছু দোমড়ানো নোট বার ক'রে নিয়ে এসে ঠাকুমাকে তা দেখালে। ঠাকুমা সবগুলো নোট এমনভাবে দ্রুত হাতে ছিনিয়ে নিলেন যেন তাঁর হাত দুটো একটা বল ছাড়া আর-কিছুই নয়।

'আমি তোমার জন্যে দাম কমাবো,' তিনি বললেন, 'তবে একটা শর্তে: কথাটা তোমায় চারপাশে চাউর ক'রে দিতে হবে।'

'জগতের একেবারে অন্যপ্রান্ত অব্দি,' ডাকহরকরা বললে, 'আমি তো সেই-জন্যেই আছি।'

এরেন্দিরা এতক্ষণ চোখের পাতা ফেলতেই পারছিলো না, এবার সে নকল চোখের পাতা খুলে নিলে, আর দৈবাৎ-পাওয়া ছেলেবন্ধুর জন্যে জাজিমের এক-

পাশে স'রে গেলো। যেই লোকটা আশ্রয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, গড়ানে পর্দায় একটা জোরালো হ্যাঁচকা টান মেরে ঠাকুমা দরজার মুখটা আটকে দিলেন।

চুক্তিটা কাজেরই হয়েছিলো। ডাকহরকরার কথায় ভুলে গিয়ে দূর-দূর থেকে লোক এলো এরেন্দিরার নতুনত্বের স্বাদ নেবার জন্যে। লোকদের পেছন-পেছন এলো জুয়োর টেবিল আর খাবারের দোকান, আর তাদের সবার পেছনে এলো, বাইসাইকেলে ক'রে, এক ছবিওলা যে শিবিরের দরজাটার উলটোদিকে একটা তেপায়ার ওপর বসালে তার শোকের আস্তিনওলা ক্যামেরাটা, পেছনে টাঙালে একটা পর্দা, তাতে ঝিলের ওপর চাঞ্চল্যহীন সব রাজহাঁস আঁকা।

তাঁর সিংহাসনে ব'সে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে-করতে ঠাকুমাকে দেখাচ্ছিলো যেন নিজের বাজারেরই অচেনা। একমাত্র যাতে তাঁর আগ্রহ ছিলো, সে হ'লো মক্কেলদের কাতারের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখা: তারা সবাই যে-যার নিজের পালা আসবার জন্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর এরেন্দিরার কাছে যাবার আগে পুরো টাকাটা তাদের দিতে হ'তো আগাম—আর ঠাকুমার আগ্রহ ছিলো সেই টাকা গুনতেই। গোড়ায় তিনি এতটাই কড়া খবরদারি করেছিলেন যে ভালো একজন মক্কেলকেও তিনি ভেতরে যেতে দেননি—তার কাছে পাঁচ পেসো কম ছিলো। তবে ক্রমে যখন মাসের পর মাস কেটে গেলো, ঠাকুমা বাস্তব দশার কাছ থেকে পাঠগুলো গিলে নিয়ে শেষটায় তেমন লোককেও ঢুকতে দিতেন যারা তাদের মাশুল জোগাতো ধর্মের পদক, পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন, বিয়ের আংটি কিংবা যা খুশি তাই, যা চকচক না-করলেও দাঁতে কেটে তিনি বুঝতে পারতেন জিনিশটা হ'লো খাঁটি সোনা।

প্রথম শহরে অনেকদিন কাটাবার পর, ঠাকুমার কাছে একটা মাল-বওয়া গাধা কেনবার মতো যথেষ্ট টাকা হ'লো, আর তিনি আরো-সব নতুন-নতুন জায়গার খোঁজে মরুভূমিতে বেরিয়ে পড়লেন—যে-সব জায়গা এরেন্দিরার দেনা শোধবার পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল ছিলো। তিনি ভ্রমণ করতেন একটা খাটুলিতে, গাধার পিঠে সেটা চাপানো হ'তো, আর নিশ্চল সূর্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এরেন্দিরা তাঁর মাথার ওপর ধ'রে রাখতো আবাশিকওলা এক ছাতা। তাদের পেছন-পেছন আসতো চারজন ইণ্ডিয়ান কুলি যারা ব'য়ে নিয়ে আসতো শিবিরের বাকি যা-কিছু: জাজিম, মেরামত ক'রে সারানো সিংহাসন, তৈলস্ফটিকে গড়া দেবদূত, আর আমাদিসদের দেহাবশেষে ভরা তোরঙ্গগুলো। বছরটার পেছন-পেছন বাইসাইকেলে চেপে আসতো ছবিওলা, কিন্তু কখনও নাগাল ধ'রে নয়, ভঙ্গিটা, যেন সে অন্যকোনো মেলায় যাচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের পর যখন ছ-মাস কেটে গিয়েছে ঠাকুমা তখন ব্যাবসাটার একটা পুরো ছবি পেলেন।

'এভাবেই যদি চলতে থাকে,' এরেন্দিরাকে বললেন, 'তুই আমাকে আট বছর সাত মাস এগারো দিনের মধ্যেই সব ধার শোধ ক'রে দিতে পারবি।'

চোখ মুদে আবার তিনি হিশেবটা খতিয়ে দেখলেন, দড়ির একটা থলে থেকে সূর্যমুখির বিচি বার করতে-করতে—সেখানে তিনি টাকাও রাখেন—তারপর তিনি ভুলটা শোধরালেন:

'সে অবশ্য ইণ্ডিয়ানদের থাকা-খাওয়ার খরচ আর অন্য-সব টুকিটাকি খরচ হিশেবে না-ধ'রেই।'

এরেন্দিরা গাধার সঙ্গে তাল রেখে-রেখে চলছিলো, ধুলোয় আর গরমে সে একেবারে কাহিল হ'য়ে নুয়ে পড়েছে। সে ঐ হিশেবের জন্যে ঠাকুমাকে কোনো তিরস্কার করলে না বটে, তবে অনেক কষ্ট ক'রেই তাকে চোখের জল চেপে রাখতে হ'লো।

'আমার হাড়গোড়ের মধ্যে শুধু কাচের গুঁড়োই আছে।'

'ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'সি, আবুয়েলা।'

সে তার চোখ বুজলো, গভীর শ্বাস টেনে নিলে তপ্ত হাওয়া, আর ঘুমের ঘোরেই সে পা ফেলে-ফেলে চলতে লাগলো।

...

দিগন্তের ধুলোর ঝড়ে ছাগলদের ভয় পাইয়ে দিয়ে খাঁচায় ভর্তি একটা ছোটো ট্রাক দেখা দিলে আর সান্ মিগেল দেল দেসিয়ের্তোর রবিবাসরীয় আলস্য ও জড়তায় পাখির কাকলি ছিলো যেন ঠাণ্ডা জলের একটা ঝাপটা। চালকের আসনে ব'সে ছিলেন এক হৃষ্টপুষ্ট ওলন্দাজ র‍্যান্‌চমালিক, ঘরের বাইরে কাটিয়ে-কাটিয়ে তাঁর গায়ের চামড়া ফেটে গিয়েছে, কাঠবেড়ালির গায়ের রঙের মতো তাঁর গোঁফ-জোড়া যেটা তিনি উত্তরাধিকার পেয়েছেন কোনো বৃদ্ধ প্রপিতামহর কাছ থেকে। তাঁর ছেলে উলিসেস, সে বসেছিলো পাশের আসনে, ছিলো সোনায় মোড়া এক কিশোর, তার ছিলো নিঃসঙ্গ নাবিক চোখ আর তার চেহারাটা ছিলো কোনো চোরাগোপ্তা দেবদূতের মতো। ওলন্দাজ র‍্যান্‌চমালিক দেখতে পেলেন একটা তাঁবুর সামনে স্থানীয় কেল্লার সব সৈন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের পালা আসার অপেক্ষায়। তারা ব'সে আছে মাটিতে, একই বোতল থেকে ঢকঢক ক'রে

মদ ঢালছে গলায়, বোতলটা চলেছে মুখ থেকে মুখে, মাথায় তাদের কাগজি-বাদামের ডালপালা যেন তারা হাড্ডাহাড্ডি হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হ'য়ে ছদ্মবেশ ধ'রে আছে। ওলন্দাজ তাঁর নিজের ভাষায় জিগেশ করলেন :

'কোন শয়তানি জিনিশ ওরা বিক্রি করছে ওখানে?'

'একটি মেয়ে,' খুব স্বাভাবিকভাবেই বললে তার ছেলে। 'তার নাম এরেন্দিরা।'

'তুই জানলি কী ক'রে?'

'মরুভূমিতে সকলেই তার কথা জানে,' উত্তরে বললে উলিসেস।

ওলন্দাজ শহরের ছোটো সরাইটার সামনে ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়লেন। উলিসেস ট্রাকেই থেকে গেলো। ক্ষিপ্র হাতে সে ব্রীফকেস খুলে ফেললে, তার বাবা যেটা আসনে ফেলে রেখে গিয়েছেন; একতাড়া নোট বার ক'রে নিয়ে কয়েক গোছা নোট রাখলে নিজের পকেটে, আর তারপর সব যেমন ছিলো তেমনি রেখে দিলে। সে-রাতে, যখন তার বাবা ঘুমুচ্ছেন, সে সরাইয়ের জানলা বেয়ে নেমে চ'লে গেলো এরেন্দিরার তাঁবুতে, কাতারের মধ্যে দাঁড়াবে ব'লে।

উৎসবের হুল্লোড় তখন চরমে। মাতাল রংরুটরা একা-একাই নাচছে যাতে বিনি পয়সায় পাওয়া গান হেলায় নষ্ট না-হয়, আর ছবিওলা রাতের ছবি তুলছে ম্যাগনেসিয়াম কাগজে। ব্যাবসার ওপর নজর রাখতে-রাখতে ঠাকুমা তাঁর কোলের ওপর ব্যাঙ্কনোটগুলো গুনছেন, ভাগ ক'রে রাখছেন সমান-সমান স্তূপে, তারপর সাজিয়ে রাখছেন সেগুলো একটা ঝুড়িতে। সে-সময়ে সারের মধ্যে মোটে বারোজন সৈন্য ছিলো, কিন্তু সন্ধের পর থেকে সারিটা ভ'রে উঠেছে বেসামরিক খদ্দেরে। সারির সব শেষে দাঁড়িয়ে আছে উলিসেস।

এবার পালা এলো বিমর্ষ, মুখগোমড়া এক সৈন্যের। ঠাকুমা শুধু যে তার পথই আটকালেন তা নয়, তার টাকার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়িও বাঁচালেন।

'না, বাছা,' তাকে বললেন তিনি। 'পৃথিবীর সব সোনা এনে দিলেও তুমি ভেতরে যেতে পারবে না। তুমি দুর্ভাগ্য নিয়ে আসো।'

সৈন্যটি—সে এখানকার নয়—হতভম্ব হ'য়ে গেলো।

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

'তুমি অলুক্ষুণে সব ছায়াকে টেনে নিয়ে আসো,' বললেন ঠাকুমা। 'শুধু তোমার মুখটা দেখলেই যে-কেউ বুঝতে পারবে।'

তিনি হাত নেড়ে তাকে চ'লে যেতে বললেন, তবে তাকে না-ছুঁয়েই; ইঙ্গিত করলেন পরের সৈন্যের জন্যে যেন সে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।

'ওহে সুপুরুষ, ভেতরে যাও,' তাকে তিনি বললেন সহৃদয়ভাবে, 'তবে বেশি সময় নিয়ো না, তোমার দেশ তোমাকে চায়।'

সৈন্যটি ভেতরে গিয়ে পরক্ষণেই ফিরে এলো, কারণ এরেন্দিরা তার ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলো। ঠাকুমা হাতের ড্যানায় টাকার ঝুড়ি ঝুলিয়ে ভেতরে গেলেন, ভেতরে অবশ্য জায়গা তেমন নেই, তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পেছনটায়, সামরিক বাহিনীর একটা খাটুলিতে, এরেন্দিরা কিছুতেই তার শরীরের কাঁপুনি থামাতে পারছে না, ভারি করুণ তার দশা, সৈন্যদের ঘামে তার সারা শরীরটা ঘিনঘিন করছে।

'আবুয়েলা,' হেঁচকি তুলে কাঁদলো সে, 'আমি ম'রে যাচ্ছি।'

ঠাকুমা কপালে হাত দিয়ে যখন দেখলেন জ্বর নেই, তখন তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

'আর মাত্র দশজন সৈন্য বাকি আছে,' ঠাকুমা বললেন।

জন্তুরা ভয় পেলে যে-রকম হাউ-মাউ করে, তেমনিভাবে এরেন্দিরা কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। ঠাকুমা বুঝতে পারলেন যে সে সত্যি বিভীষিকার সীমা পেরিয়ে গেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে চাপড়ে-চাপড়ে তিনি তাকে শান্ত করলেন।

'মুশকিল হ'লো তুই ভারি দুবলা,' তিনি তাকে বললেন, 'বাস, বাস, আর কাঁদে না, বরং ওষধি মাখানো জলে স্নান ক'রে নে, তাহ'লেই রক্ত ফের শান্ত হবে।'

এরেন্দিরা আরেকটু শান্ত হ'লে তিনি তাঁবু থেকে বেরুলেন আর অপেক্ষা-ক'রে-থাকা সৈন্যটিকে তার টাকা ফিরিয়ে দিলেন। 'আজকের মতো এই অব্দি,' তিনি তাকে বললেন। 'কাল এসো, আমি তোমাকে একেবারে সারির সামনে আসতে দেবো।' তারপর তিনি সার দিয়ে দাঁড়ানো অন্যদের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বললেন :

'বাচ্চে লোক, আজ এই অব্দিই। আবার কাল সকাল ন-টায়।'

সৈন্য ও বেসামরিক খদ্দেররা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ ক'রে সার থেকে বেরিয়ে এলো। ঠাকুমা তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, মেজাজ তাঁর শরীফ, কিন্তু ঐ সর্বনেশে দোর্দণ্ড তিনি হেই-হেই ক'রে ঘোরাচ্ছেন।

'তোমরা সবাই যে শুধু আস্ত একেকটা গাড়ল তা-ই নয়, তোমাদের কোনো দয়ামায়াও নেই। অন্যদের কথা তোমরা ভুলেও ভাবো না।' ঠাকুমা চেঁচিয়ে বললেন, 'মেয়েটা কীসে তৈরি ব'লে তোমাদের মনে হয়? লোহায়? ওর জায়গায়

তোমরা হ'লে কী করতে দেখতে পারলে ভালো হ'তো। ইতর! বদমায়েশ! শু-খোর বজ্জাত!'

লোকেরা উত্তরে তাকে আরো বাছা-বাছা খিস্তি করলে—কিন্তু এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ ঠাকুমা ভালোই শামাল দিলেন—আর ঐ দোর্দণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন পাহারায়; শেষটায় লোকে খাবার-টেবিল তুলে নিয়ে গেলো, ভেঙে তছনছ ক'রে দিলে জুয়োর আখড়াগুলো। ঠাকুমা যেই তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে যাবেন হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো উলিসেসের ওপর, জীবনের মতোই বড়ো, একা-একা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার ফাঁকায় যেখানে আগে অত লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলো। কেমন-একটা অলীক আভা ঘিরে আছে তাকে, অন্ধকারেও তাকে যে দেখা যায় তা বুঝি তার রূপের অমন জেল্লার জন্যেই।

'তুমি,' ঠাকুমা তাকে জিগেশ করলেন, 'তোমার ডানার কী হ'লো?'

'যাঁর ডানা ছিলো তিনি ছিলেন আমার ঠাকুর্দা,' উলিসেস তার স্বাভাবিক ধরনেই উত্তর দিলে, 'তবে কেউই সে-কথা বিশ্বাস করেনি।'

কী-রকম মোহিত হ'য়ে ঠাকুমা আবার তাকে নিরীক্ষণ করলেন। 'হুম, আমি বিশ্বাস করি,' বললেন তিনি। 'আচ্ছা, কালকে ডানা দুটি প'রে চ'লে এসো।' তিনি তাঁবুর মধ্যে চ'লে গেলেন, উলিসেসকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে গেলেন, যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই, জলন্ত।

স্নান ক'রে নেবার পর এরেন্দিরার অনেক ভালো লাগলো। আঁচলে ঝালর লাগানো একটা খাটো শেমিজ পরেছে সে, শুতে যাবার আগে চুল শুকোচ্ছে, কিন্তু এখনও তাকে চোখের জলের ঢল আটকে রাখবার জন্যে চেষ্টা করতে হচ্ছে। তার ঠাকুমা ঘুমোচ্ছেন।

এরেন্দিরার বিছানার পেছন থেকে, খুব আস্তে-আস্তে, আবির্ভূত হ'লো উলিসেসের মাথা। শঙ্কাতুর স্বচ্ছ টলটলে ডাগর চোখ দুটি দেখতে পেলে এরেন্দিরা, কিন্তু কিছু বলবার আগে সে তোয়ালে দিয়ে জোরে-জোরে মাথা ঘষলো এটাই প্রমাণ করতে যে এ তার চোখের দেখার ভুল নয়। যখন উলিসেস প্রথমবার চোখের পাতা ফেললে, এরেন্দিরা খুব নিচু গলায় তাকে জিগেশ করলে:

'কে তুমি?'

উলিসেস তাকে নিজের কাঁধ অব্দি দেখালে। বললে, 'আমার নাম উলিসেস।' এরেন্দিরাকে সে দেখালে যে-নোটগুলো সে চুরি করেছে, আর জুড়ে দিলে:

'আমার কাছে টাকা আছে।'

এরেন্দিরা তার হাত রাখলে বিছানায়, নিজের মুখটা উলিসেসের একেবারে কাছে নিয়ে এলো, তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলো যেন এটা কিণ্ডার-গার্টেনের বাচ্চাদের একটা খেলা।

'তোমার তো সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার কথা,' সে তাকে বললে।

উলিসেস বললে, 'আমি সারা রাত দাঁড়িয়ে থেকেছি।'

'বেশ, কিন্তু এখন আমার এমন লাগছে যে মনে হচ্ছে কেউ যেন বুকটায় এত-ক্ষণ ধ'রে মুগুর দিয়ে পিটিয়েছে।'

ঠিক তক্ষুনি ঠাকুমা ঘুমের ঘোরে তাঁর প্রলাপ শুরু করলেন।

'শেষ বৃষ্টি পড়ার পর কুড়ি বছর কেটে গিয়েছে,' ঠাকুমা বললেন। 'সে ছিলো এমনি ভয়াবহ তুফান যে বৃষ্টি মিশে গিয়েছিলো সমুদ্রের জলের সঙ্গে, আর পরের দিন সকালে বাড়িটা ভ'রে গিয়েছিলো শামুকে গুগলিতে আর তোর ঠাকুর্দা আমাদিস—আহা, তার আত্মা শান্তিতে থাকুক—দেখতে পেয়েছিলো জলজলে একটা বিদ্যুৎরশ্মির চাদর ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়।'

উলিসেস আবার বিছানার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। এরেন্দিরা মজা পেয়ে মুচকি একটা হাসি দেখালে তাকে।

'ভয় পেয়ো না,' সে তাকে বললে। 'ঘুমের ঘোরে ঠাকুমা সবসময়েই কেমন পাগলামি করে, কিন্তু কোনো ভূমিকম্পও তাকে আর জাগাতে পারবে না।'

উলিসেস পুনরাবির্ভূত হ'লো। এরেন্দিরা তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে মুচকি হাসলে যাতে একটু দুষ্টুমি মেশানো—অবশ্য একটু স্নেহও মেশানো তাতে। আর জাজিম থেকে নোংরা চাদরটা সে তুলে নিলে।

'এসো,' সে বললে, 'চাদরটা পালটাতে আমায় সাহায্য করো।'

তখন উলিসেস বিছানার পেছন থেকে বেরিয়ে এলো, এসে চাদরের একটা কোনা ধরলো। চাদরটা যেহেতু জাজিমটার চাইতে বড়ো, ওদের সেটাকে কয়েক দফা ভাঁজ করতে হ'লো। প্রতিবার ভাঁজ করার সঙ্গে-সঙ্গে উলিসেস এরেন্দিরার কাছে আরো-কাছে এসে পৌঁছুলো।

'তোমাকে একবার চোখে দেখবার জন্যে আমি একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছিলাম,' হঠাৎ উলিসেস বললে। 'সকলেই বলে তুমি খুবই সুন্দরী, আর তারা ঠিকই বলে।'

'কিন্তু আমি ম'রে যাচ্ছি,' বললে এরেন্দিরা।

'আমার মা বলেন মরুভূমিতে যারা মারা যায় তারা আকাশে স্বর্গে যায় না, সমুদ্রে যায়,' বললে উলিসেস।

এরেন্দিরা নোংরা চাদরটা সরিয়ে আরেকটা চাদর পাতলো জাজিমে—এ-চাদরটা ধবধবে পরিষ্কার, ইস্ত্রি-করা।

'আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি,' এরেন্দিরা বললে।

'সে প্রায় মরুভূমির মতোই, তবে বালির বদলে শুধু জল,' বললে উলিসেস।

'তাহ'লে তো তার ওপর দিয়ে হাঁটতে পারবে না তুমি।'

'আমার বাবা একজনকে জানতেন যিনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন,' বললে উলিসেস, 'তবে সে অনেকদিন আগে।'

এরেন্দিরা মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তবু সে ঘুমুতেই চাচ্ছিলো এখন।

'যদি তুমি কাল খুব সকাল-সকাল আসো তবে সারির একেবারে প্রথমে থাকতে পারবে,' সে বললে।

উলিসেস বললে, 'আমি ভোরবেলাতেই বাবার সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি।'

'এ-পথ দিয়ে তুমি আর ফিরবে না নাকি!'

'তা কে বলতে পারে?' উলিসেস বললে। 'আমরা শুধু দৈবাৎ এখানে এসে পড়েছি, কারণ সীমান্তে যাবার পথটা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

এরেন্দিরা চিন্তিতভাবে তার ঘুমন্ত ঠাকুমার দিকে তাকালে।

'আচ্ছা,' সে মন স্থির ক'রে ফেললে। 'টাকাটা দাও আমায়।'

উলিসেস নোটের গোছাটা তাকে দিয়ে দিলে। এরেন্দিরা বিছানায় শুয়ে পড়লো, কিন্তু উলিসেস যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে কি-রকম কাঁপতে লাগলো, সেই চরম মুহূর্তে তার প্রতিজ্ঞা কেমন যেন দুর্বল হ'য়ে গিয়েছে। এরেন্দিরা তার হাত ধ'রে তাকে তাড়া লাগালে, আর শুধু তখনই সে উলিসেসের দুর্দশাটা বুঝতে পারলে। এই ভয়টার সঙ্গে এরেন্দিরার চেনা আছে।

'এই বুঝি তোমার প্রথমবার?' এরেন্দিরা তাকে জিগেশ করলে।

উলিসেস কোনো জবাব দিলে না, বরং শুকনো একটু হাসলো। এরেন্দিরা একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে গেলো।

'আস্তে শ্বাস নাও,' সে তাকে বললে। 'প্রথমবারে সবসময়েই এমন হয়। পরে তুমি আর এ-সব খেয়ালও করবে না।'

এরেন্দিরা তাকে তার পাশে শোয়ালে আর যখন সে তার জামা-কাপড় খুললো তখন সে তাকে ঠিক মায়ের মতো শান্ত করলে।

'তোমার নাম কী?'

'উলিসেস।'

'এ মা, এ যে গ্রিঙ্গো নাম,' বললে এরেন্দিরা।

'না-না, এটা নাবিকের নাম।'

এরেন্দিরা তার বুকের জামা খুলে দিলে, কতগুলো অনাথ চুমু খেলে তাকে, ঘ্রাণে নিলে তার গায়ের গন্ধ।

'তোমাকে দেখে মনে হয় আগাগোড়া সোনায় বানানো,' সে বললে, 'অথচ তোমার গায়ে ফুলের গন্ধ।'

'এ নিশ্চয়ই নারঙ্গের গন্ধ,' বললে উলিসেস।

আগের চাইতে অনেকটা শান্ত, সে একটা যোগসাজশের ভঙ্গিতে মৃদু হাসলে।

'লোককে ভুল বোঝাবার জন্যে আমরা অনেক পাখি নিয়ে ঘুরে বেড়াই,' আরো জানালে সে, 'কিন্তু আসলে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে গাদা-গাদা নারঙ্গ পাচার ক'রে দিচ্ছি।'

'নারঙ্গ তো বেআইনি কিছু নয়,' বললে এরেন্দিরা।

'এগুলো কিন্তু বেআইনি,' বললে উলিসেস। 'একেকটার দাম পঞ্চাশ হাজার পেসো।'

অনেকদিন পরে এরেন্দিরা একটু প্রাণ খুলে হাসলো।

'জানো, তোমার কী আমার ভালো লাগে?' সে বললে, 'কি-রকম গম্ভীর-গম্ভীর মুখ ক'রে তুমি কত-কী আজগুবি কথা বানিয়ে বলো।'

এরেন্দিরা আবার স্বতঃস্ফূর্ত আর মুখর হ'য়ে উঠেছে, যেন উলিসেসের সরলতা তার নিষ্পাপ ভাবভঙ্গি শুধু তার মেজাজটাই পালটে দেয়নি, যেন তার চরিত্রটাও পালটে দিয়েছে। ঠাকুমা—দুর্ভাগ্য এত অল্প দূরে—এখনও তাঁর ঘুমের ঘোরে প্রলাপ ব'কে চলেছেন।

'তখনকার দিনে, মার্চমাসের গোড়ায়, তারা তোকে বাড়ি নিয়ে এসেছিলো,' ঠাকুমা বলছেন, 'তোকে দেখাচ্ছিলো তুলোয় মোড়া একটা গিরগিটির মতো। আমাদিস—তোর বাবা—তার তখন কচি বয়েস, সুপুরুষ, সেদিন বিকেলে এত খুশি হ'য়ে উঠেছিলো যে কুড়িটা গাড়ি বোঝাই ক'রে ফুল আনতে পাঠিয়েছিলো, আর সে রাস্তা দিয়ে ফুল ছড়াতে-ছড়াতে এসেছিলো, শেষটায় সারা গাঁটাই সমুদ্রের মতো ফুলে-ফুলে সোনারং হ'য়ে উঠলো।'

বিশাল সব চীৎকার ক'রে, গোঁয়ারভাবে, তিনি কয়েক ঘণ্টা ধ'রে হৈ-হৈ ক'রে কথা ব'লেই চললেন। কিন্তু উলিসেস তাঁর কোনো কথাই শুনতে পায়নি, কারণ এরেন্দিরা তাকে এত ভালোবেসেছে, এত খাঁটি নিখাদ সেই ভালোবাসা

যে সে তাকে আবার ভালোবেসেছে আদ্ধেক দামে, যখন তার ঠাকুমা উন্মাদের মতোই ব'লেই চললেন কী-সব, আর শেষটায় এরেন্দিরা তাকে ভোর হওয়া অব্দি বিনি দামেই ভালোবেসে চললো।

...

একদল আশ্রমিক তাদের ক্রুশফলকগুলো ধ'রে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো। দুর্ভাগ্যের হাওয়ার মতোই এক খ্যাপা হাওয়া তাদের রুক্ষ মোটা কেম্বিস কাপড়ের আলখিল্লা আর তাদের রুক্ষ কর্কশ দাড়িগুলো সব ঝাঁকাচ্ছে, তারা কোনোমতে অনেক চেষ্টা ক'রে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে। তাদের পেছনে আছে গির্জের আশ্রম, এক উপনিবেশিক শিলাময় স্তূপ, রূঢ় কর্কশ চুনকাম-করা দেয়ালের ঠিক ওপরটায় আছে খুদে এক ঘণ্টাঘর।

সবচেয়ে তরুণ যে আশ্রমিক তারই ওপর দলটার দায়িত্ব, আঙুল দিয়ে দেখালে চকচকে কাদামাটিতে কেমন-একটা স্বাভাবিক ফাটল ধরেছে।

চেঁচিয়ে বললে, 'এই দাগটা পেরিয়ে তোমরা আসবে না।'

যে-চারজন ইণ্ডিয়ান ঠাকুমাকে তাঁর তক্তা লাগানো খাটুলিতে ক'রে ব'য়ে আনছিলো, ঐ ধমকটা শোনবামাত্র তারা থমকে দাঁড়ালো। যদিও খাটুলির কাঠগুলোর ওপর বেশ অস্বচ্ছন্দেই ব'সে ছিলেন ঠাকুমা আর তাঁর মনমেজাজ যদিও মরুভূমির ধুলোয় আর ঘামে কেমন ভোঁতা হ'য়ে এসেছিলো, ঠাকুমা তবু তাঁর উদ্ধত বদমেজাজটা আদ্যোপান্ত বজায় রাখলেন। এরেন্দিরা আসছিলো পায়ে হেঁটে। খাটুলিটার পেছন-পেছন মালপত্র ব'য়ে আসছিলো আটজন ইণ্ডিয়ানের এক সার আর সব শেষে তার বাইসাইকেলে চেপে আসছিলো ছবিওলা।

'মরুভূমি কারু বাপের জমি নয়,' বললেন ঠাকুমা।

'মরুভূমি ঈশ্বরের,' আশ্রমিক বললে, 'আর তোমরা তোমাদের ঐ ঘিনঘিনে ব্যাবসায় তাঁর সব পবিত্র বিধি লঙ্ঘন করেছো।'

ঠাকুমা ততক্ষণে শনাক্ত করেছেন আশ্রমিকের উপদ্বীপের ভাষা, কথ্য বুলির বিশেষ ব্যবহার ; চুঁশোচুঁশি সংঘর্ষটা তিনি এড়িয়ে গেলেন : তার অনড় আপোষ-হীন মতামতের দেয়ালে মাথা ঠুকে তিনি মাথা ভাঙতে চান না। তিনি পরক্ষণেই তাঁর আপন মূর্তি ধরলেন।

'আমি, বাপু, তোমার এইসব রহস্য বুঝি না।'

আশ্রমিক আঙুল তুলে এরেন্দিরাকে দেখালে।

'ঐ বালিকা নিতান্তই অপ্রাপ্তবয়স্ক।'

'কিন্তু সে আমার নাৎনি।'

'তাহ'লে তো আরো খারাপ,' আশ্রমিক উত্তর দিলে। 'স্বেচ্ছায় একে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে যাও, নতুবা আমরা অন্য উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবো।'

তারা যে অ্যান্দুর যাবে, এটা ঠাকুমা আশা করেননি।

'তাই যদি হয় তো ঠিক আছে।' তিনি আতঙ্কিত হ'য়ে আত্মসমর্পণ করলেন। 'কিন্তু আগেই হোক পরেই হোক, আমি এখান দিয়ে যাবোই।'

আশ্রমিকদের সঙ্গে সংঘাতের তিনদিন পরে, ঠাকুমা আর এরেন্দিরা গির্জের আশ্রমের কাছেই একটা গ্রামে ঘুমুচ্ছিলো, এমন সময় একদল সন্তর্পণ নিঃশব্দ লোক, পদাতিক বাহিনীর টহলের মতো পা টিপে-টিপে এসে, লুকিয়ে, তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লো। এরা সবশুদ্ধ ছ-জন, ইণ্ডিয়ান নবীশ, বলিষ্ঠ আর কচিবয়েস, তাদের রুক্ষ কাপড়ের আলখিল্লা যেন জ্যোৎস্নায় জলজল করছিলো। টুঁ শব্দটি না-ক'রে তারা এরেন্দিরাকে একটা মশারির জালে জড়ালো, তারপর তাকে না-জাগিয়েই তাকে তারা তুলে নিলে, তাকে যখন তারা ব'য়ে নিয়ে গেলো মনে হ'লো মস্ত একটা ক্ষীণজীবী নশ্বর মাছ যেন চাঁদিম জালে ধরা প'ড়ে গিয়েছে।

তাঁর নাৎনিকে আশ্রমিকদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে উদ্ধার করতে কোনো উপায়ই বাদ দিলেন না ঠাকুমা। যখন সব চেষ্টাই—তা সে সরলসোজাই হোক বা অতীব ঘোরপ্যাঁচওলাই হোক—বিফল হ'লো, শুধু তখনই তিনি পুর কর্তৃপক্ষের শরণ নিলেন, যে-বেসামরিক পৌর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো একজন সামরিক কর্মচারীর ওপর। তাঁকে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর বাড়ির উঠোনে, বুক খোলা, সামরিক বাহিনীর একটা রাইফেল তাগ ক'রে জলন্ত আকাশে একটা কালো নিঃসঙ্গ মেঘের দিকে গুলি ছুঁড়ছেন। মেঘটাকে গুলিতে ঝাঁঝরা ক'রে তিনি বৃষ্টি নামাতে চাচ্ছিলেন, আর তাঁর গুলিগুলো হচ্ছিলো ক্ষিপ্ত আর নিষ্ফল, তবে তিনি ঠাকুমার কাহনটা শোনবার মতো জরুরি সময়টা দিলেন।

'আমি তো কিছু করতে পারবো না,' ঠাকুমার সব কথা শোনবার পর তাঁকে তিনি ব্যাখ্যানা ক'রে বোঝালেন। 'পোপের সঙ্গে শাসকদের যে-চুক্তি হয়েছে সেই অনুযায়ী পুরুৎরা প্রাপ্তবয়স্ক না-হওয়া অব্দি যে-কাউকে আটকে রাখতে পারে। কিংবা তার বিয়ে-হওয়া অব্দি।'

'আপনাকেই-বা তাহ'লে এখানে মেয়র হিশেবে রেখেছে কেন ওরা?' ঠাকুমা জিগেশ করলেন।

'বৃষ্টি নামাবার জন্যে,' মেয়রের সাফ জবাব।

তারপর যখন দেখলেন মেঘটা পাল্লার বাইরে চ'লে গিয়েছে, মেয়র তাঁর সরকারি দায়িত্ব মুলতুবি রেখে ঠাকুমাকেই পুরোপুরি মনোযোগ দিলেন।

'আসলে আপনার এমন-একজনকে চাই যার যথেষ্ট ওজন আছে, যে আপনার হ'য়ে জামিন থাকবে,' মেয়র বললেন ঠাকুমাকে। 'এমন-কেউ যে হলফ ক'রে আপনার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে শংসাপত্র দেবে, নাম সই ক'রে চিঠি লিখে যে আপনার যাবতীয় সদ্‌গুণ সম্বন্ধে জবান দেবে। আপনি সেনাদোর [সাংসদ] ওনেসিমো সান্‌চেসকে চেনেন?'

নগ্ন সূর্যের তলায় তাঁর বিপুল ও নশ্বর পাঞ্চভৌতিক নিতম্বের তুলনায় বড্ড ছোটো একটা চৌকির ওপর ব'সে ঠাকুমা বেজায় রেগে গিয়ে উত্তর দিলেন :

'মরুভূমির এই বিশালের মধ্যে আমি তো নিতান্তই এক নগণ্য স্ত্রীলোক।'

মেয়র, তাঁর ডান চোখটা গরমে কুঁচকে গিয়েছে, তাঁর দিকে করুণার ভঙ্গিতে তাকালেন।

'তাহ'লে, সেনিওরা, মিছেমিছি সময় নষ্ট করবেন না,' মেয়র বললেন, 'আপনাকে তাহ'লে জাহান্নামেই ভাজা-ভাজা হ'তে হবে।'

ঠাকুমা, অবশ্য, ভাজা-ভাজা হলেন না। আশ্রমটার ঠিক মুখোমুখি তিনি তাঁর তাঁবু গাড়লেন, তারপর ভাবতে বসলেন, যেমন ক'রে কোনো যোদ্ধা একা-একাই সুরক্ষিত কোনো নগরী দখল ক'রে নেবার কথা ভাবে। ভ্রাম্যমাণ ছবিওলা, যে তাঁকে খুবই ভালো চিনে ফেলেছিলো, তার সব মালপত্র তার সাইকেলে চাপিয়ে একা-একাই কেটে পড়বার উদ্‌যোগ করছিলো, বিশেষত যখন সে লক্ষ করলে যে ঠা-ঠা রৌদ্রের মধ্যে ঠাকুমা আশ্রমের দিকে ঠায় নজর রেখে ব'সে আছেন।

'দেখাই যাক, কে আগে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে,' ঠাকুমা বললেন, 'ওরা না আমি!'

'ওরা এখানে আছে তিন-তিনশো বছর—আর এখনও ওরা সব সহ্য করতে পারছে,' ছবিওলা বললে, 'আমি চললাম।'

শুধু তখনই ঠাকুমা দেখতে পেলেন যে সাইকেলে তার সব জিনিশপত্তর চাপানো।

'তুমি আবার কোথায় চললে?'

'হাওয়া যেখানে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়,' বললে ছবিওলা, আর সত্যি চ'লেও গেলো। 'পৃথিবী তো বিপুলা।'

ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'ওহে অকৃতজ্ঞ, তুমি যত বড়ো ব'লে ভাবছো পৃথিবী তত বড়ো নয় অবিশ্যি।'

বিষম রাগ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু তাঁর মাথা নড়ালেন না, তাহ'লে যে ঐ আশ্রম থেকে নজর সরাতে হয়। ঐ খনিজ উত্তাপের অনেক অনেক দিন কিংবা খ্যাপা হাওয়ার অনেক অনেক রাত তিনি আর ওখান থেকে নড়লেন না, কারণ সারাক্ষণই তিনি মগ্ন হ'য়ে ছিলেন ভাবনায়, তাছাড়া আশ্রম থেকেও এর মধ্যে কেউ বেরোয়নি। তাঁবুর পাশেই ইণ্ডিয়ানরা তালপাতা দিয়ে একটা আটচালা বানিয়ে তাদের দোলখাটিয়াগুলো সেখানেই টাঙিয়ে দিয়েছিলো, ঠাকুমা কিন্তু তাঁর সিংহাসনে ব'সে মাথা নেড়ে-নেড়ে অনেক রাত অব্দি নজর রেখেই চলতেন আর তাঁর বটুয়া থেকে না-বাঁধা দানাশস্য গালে ফেলে চিবুতেন—যেন অপরাজেয় অলস বিশ্রামে কোনো বলীবর্দ।

এক রাত্তিরে ঠাকুমার একেবারে গা ঘেঁষে গেলো তেরপল-ঢাকা ট্রাকের একটা বহর, আর সে-সব ট্রাকে একমাত্র যে-আলো জ্বলছিলো তা একটা রঙিন বাল্‌বের মালা, দেখে মনে হচ্ছিলো যেন ঘুমের ঘোরে চলেছে কতগুলো বেদি। ঠাকুমা তাদের তক্ষুনি চিনে ফেললেন, কারণ এগুলো ঠিক আমাদিসদের ট্রাকের মতো দেখতে। বহরের শেষ ট্রাকটা গতি মন্থর ক'রে শেষটায় পুরোপুরি থেমেই পড়লো আর চালকের খোপ থেকে একটা লোক নেমে এসে পেছনে কী যেন সারাতে চেষ্টা করলে। তাকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন আমাদিসদেরই হুবহু, অবিকল, সংস্করণ, মাথায় কানা-তোলা টুপি, পায়ে উঁচু বুটজুতো, বুকে কাটাকুটি ক'রে গেছে দু-সার কার্তুজের বন্ধনী, একটা ফৌজি রাইফেল আর দুটো পিস্তল। অপ্রতিরোধ্য প্রলোভনে প'ড়ে ঠাকুমা লোকটাকে ডাকলেন।

'চিনতে পারছো না আমি কে?' তাকে তিনি জিগেশ করলেন।

লোকটা একটা বিজলি মশাল জেলে নির্দয়ভাবে তাঁকে আলো ক'রে দিলে। কড়া নজর রেখে অবসন্ন মুখটকে সে নিরীক্ষণ করলে এক ঝলক : চোখ দুটি অবসাদে মিইয়ে এসেছে, চুল শুকিয়ে জটপাকানো, তবু স্ত্রীলোকটি, এই বয়েসেও, এমন দুরবস্থাতেও, মুখের ওপর অমন রূঢ় আলো সত্ত্বেও, লোকটা বলতে পারতো, তবু এই রমণীই ছিলো জগতের সবচেয়ে সেরা রূপসী। যখন সে তাঁকে নিরীক্ষণ ক'রে নিশ্চিত হ'লো যে তাঁকে সে এর আগে কখনোই ছাখেনি, সে আলো নিভিয়ে দিলে।

'একটা জিনিশ আমি ঠিক জানি যে আপনি চিররহস্যের করুণাময়ী কুমারী নন।'

'ঠিক তার উলটো,' ঠাকুমা অতীব মধুর স্বরে বললেন। 'আমিই সেই মহিলা।'

বিশুদ্ধ সহজাত শক্তির বশেই লোকটা তার পিস্তলের বাঁটে হাত রাখলে।

'কোন মহিলা? কী মহিলা?'

'বড়ো আমাদিসের।'

'আপনি তাহ'লে এই জগতেরই নন,' সে কী-রকম টান-টান হ'য়ে গিয়ে বললে। 'কী চাই আপনার?'

'আমার নাৎনিকে—বড়ো আমাদিসের নাৎনিকে—উদ্ধার করবার জন্যে তোমার সাহায্য চাই। আমাদের ছেলে আমাদিসের মেয়ে গির্জের এই আশ্রমে বন্দী হ'য়ে আছে।'

লোকটা তার ভয়কে জয় করলে।

'ভুল দরজায় কড়া নেড়েছেন আপনি,' সে বললে। 'আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমরা ভগবানের কাজে-কারবারে জড়িয়ে পড়বো, তাহ'লে বোঝা যায় আপনি নিজের যে-পরিচয় দিলেন সেটা ঠিক নয়—আপনি তাহ'লে মোটেই আপনি নন, আমাদিসদের আপনি কস্মিন কালেও জানতেন না এবং চোরাচালানের কারবারটা যে কী সে-সম্বন্ধে আপনার কোনো বেশ্যা-ধারণাও নেই।'

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুমা অন্যদিনের চেয়েও কম ঘুমুলেন। শুয়ে-শুয়ে জেগে রইলেন তিনি, গভীর ভাবলেন নানা বিষয়ে, গায়ে চাপানো এক পশমিনার চাদর, আর ভোর হবার আগে তাঁর স্মৃতি জট পাকিয়ে গেলো, আর চাপা-পড়া সেই ক্ষিপ্ত প্রলাপ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলো তাঁর ভেতর থেকে যদিও তিনি তখন জেগেই আছেন, আর তাঁকে আঁটো ক'রে বাঁধতে হ'লো বুক, হাত চাপা দিতে হ'লো বুকে, যাতে সমুদ্রের ধারের সেই বাড়ি তার সব মস্ত লাল-লাল ফুল যেখানে তিনি সুখী ছিলেন এককালে তার সেই বাড়ির স্মৃতি যেন এখন তাঁর দম আটকে না-দেয়। এইভাবেই প'ড়ে রইলেন তিনি, যতক্ষণ-না আশ্রমের ঘণ্টা বাজলো আর দিনের প্রথম আলো পড়লো জানলায়-জানলায় আর মরুভূমিতে—আর গির্জের প্রভাতী উপাসনার গরম-গরম রুটির গন্ধে মরুভূমি উপচে পড়লো। শুধু তখনই তিনি ঝেড়ে ফেললেন তাঁর অবসাদ, তাঁর ক্লান্তি; কেমন-একটা বিভ্রম তাঁকে যেন প্রতারণা করলে: যেন এরেন্দিরা উঠে প'ড়ে মরীয়া হ'য়ে পালাবার একটা উপায় খুঁজছে, এসে পড়তে চাচ্ছে তাঁর কাছে।

তারা তাকে জোর ক'রে আশ্রমে ধ'রে নিয়ে যাবার পর থেকে এরেন্দিরা অবশ্য এক রাত্রির জন্যেও তার ঘুম হারায়নি। তারা ঝোপ-ছাঁটার কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলেছে তার চুল যতক্ষণ-না তার মাথা দেখায় কোনো বুরুশের মতো, তার গায়ে

চাপিয়েছে কোনো সন্ন্যাসীর রুক্ষ আলখিল্লা, তাকে দিয়েছে একটা ঝাড়ন আর চুন-গোলা বালতি যাতে সে প্রতিবার সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে বা নেমে গেলে সিঁড়িটায় সে চুনকাম ক'রে দিতে পারে। খচ্চরের কাজ এটা, কারণ অনবরত অবিশ্রাম কাদামাখা জুতো প'রে আশ্রমিকরা আর নবীশ বাহকরা আসছে যাচ্ছে, কিন্তু তবু এরেন্দিরার মনে হচ্ছিলো প্রতিদিনই এখন যেন রোববার—কয়েদির সেই ঝোড়ো নৌকোর মতো বিছানার পর ছুটির দিনটায় যখন সে শুয়ে থাকতো। তাছাড়া রাত্তিরে শুধু সে একাই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তো না, কারণ এই আশ্রম নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো—না, শয়তানকে ঠেকাবার জন্যে নয়, বরং মরুভূমির বিরুদ্ধেই এক অন্তহীন লড়াইতে। এরেন্দিরা নিজের চোখে দেখেছে ইণ্ডিয়ান নবীশেরা গোরুদের দুধ দুইবার জন্যে ডালকুত্তোর মতো হন্যে হ'য়ে যায়, তক্তার ওপর লাফঝাঁপ দেয় দিনের পর দিন পনীরকে চেপটে আঁটো ক'রে বানাবার জন্যে, বা কোনো ছাগীকে কীভাবে তারা সাহায্য করে যখন কঠিন হ'য়ে ওঠে তার প্রসবচেষ্টা। সে তাদের দেখেছে চামড়াপাকানো ডকশ্রমিকদের মতো ঘেমে-নেয়ে অস্থির, জলাধার থেকে জল আনবার সময়; হাতে-হাতে জল ছিটোচ্ছে কোনো দুঃসাহসী বাগানে অন্য নবীশেরা যাকে নিড়ানি দিয়ে সাফ করছে, চকমকিপাথরের মতো কঠিন সেই মরুভূমিতে সব্জি ফলাবার জন্যে। নিজের চোখেই সে দেখেছে পার্থিব নরকচুল্লিগুলো রুটি যেখানে সেঁকা হয় আর সেই ঘরগুলোও দেখেছে যেখানে জামাকাপড় ইস্ত্রি করা হয়। সে দেখেছে এক সন্নেসিনি উঠোনে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে এক শুওরকে, পলাতক জন্তুটির কান পাকড়ে ধ'রে কীভাবে তার টানে আছড়ে প'ড়ে হিঁচড়ে গেছে আর কিছুতেই তাকে ছেড়ে না-দিয়ে গড়াগড়ি খেয়েছে কাদায়, আর চামড়ার ওপর-জামা পরা দুই নবীশ এসেছে শুওরটাকে বাগে আনবার জন্যে তাকে সাহায্য করতে আর একজন একটা কশাইয়ের ছুরি দিয়ে কেটেছে শুওরটার গলা আর সবাই মিলে কেমন ক'রে রক্তে-কাদায় মাখামাখি হ'য়ে গেছে। রুগীদের অন্তরণমহলে সে দেখেছে ক্ষয়রোগে-ভোগা সন্নেসিনিদের—রাতকাপড়ের কাফনে মোড়া—যেন অপেক্ষা ক'রে আছে ঈশ্বরের শেষ অনুজ্ঞাটির জন্যে, আর তারা যখন অলিন্দে ব'সে কনের সাজ বোনে পুরুষরা ধর্মপ্রচার ক'রে বেড়ায় ধূ-ধূ মরুভূমিতে। এরেন্দিরা এতদিন যেন তার নিজেরই ছায়ায় বেঁচে ছিলো, এখন সে একে-একে আবিষ্কার করছে সুন্দর আর আতঙ্কের অন্যসব রূপ যা সে কখনও কল্পনাও করেনি তার ঐ সংকীর্ণ শয্যার জগতে; কিন্তু তাকে আশ্রমে ধ'রে নিয়ে যাবার পর থেকে সবচেয়ে ভোঁতা স্থূল অথবা সবচেয়ে মনোহর নবীশও

তার মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারেনি। একদিন সকালে, সে যখন তার বালতিতে শাদা রং গুলছে, সে শুনতে পেলে তারের যন্ত্রে বাজানো সুর যেটা এমনই হালকা আলোর মতো যা মরুভূমির সব আলোর চাইতেও অনেক বেশি স্বচ্ছ, টলটলে। এই অলৌকিকে সম্মোহিত হ'য়ে, সে উঁকি মেরে ঢাখে এক বিশাল শূন্য আপ্যায়ন ঘর, দেয়ালগুলো ফাঁকা আর বড়ো-বড়ো জানলার মধ্য দিয়ে চোখধাঁধানো জুনের আলো ঝ'রে পড়ছে আর যেন থমকে আছে স্থির ; আর ঘরের ঠিক মাঝখানে সে দেখতে পেলে এক পরমাসুন্দরী সন্নেসিনিকে যাকে সে এর আগে কখনোই চোখে ঢাখেনি, সন্নেসিনি ক্ল্যাভিক্যাডে ঈস্টারপরবের এক অরেটোরিও বাজাচ্ছে। চোখের পাতা একবারও না-ফেলে এরেন্দিরা শুনতে লাগলো সুর, তার বুকটা যেন সুতোর ডগায় ঝুলছে, আর সে শুনেই চললো সুর যতক্ষণ-না মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টা বাজলো। খাবার পর, যখন সে তার খাগড়ার বুরুশ দিয়ে সিঁড়িতে শাদা রঙের পোঁচ বোলাচ্ছে, সে অপেক্ষা ক'রেই রইলো যতক্ষণ-না সব নবীশেরা সিঁড়ি বেয়ে আসা-যাওয়া ওঠা-নামা থামালে, তারপর যখন সে একেবারেই একা, কেউ যখন তাকে শোনবার নেই, শুধু তখনই আশ্রমে আসবার পর এই প্রথম সে কথা বললে।

বললে, 'আমি সুখী।'

ঠাকুমার মনে যে-আশা ছিলো যে এরেন্দিরা নিজেই পালিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে, এই কথা, কাজেই, তাতেই ইতি টেনে দিলে ; তবে ঈস্টারের সাত সপ্তাহ পরে পেন্টেকস্টের পরবের আগে পর্যন্ত সে বজায় রেখে গেলো তার গ্র্যানাইট মৌনতা। সেই সময়ে আশ্রমিকেরা মরুভূমিতে চিরুনি চালিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো গর্ভবতী যত উপপত্নীকে, যাতে তাদের বিয়ে দিয়ে দিতে পারে। একটা লজ্‌ঝড় ট্রাকে ক'রে চার-চারজন অতিসশস্ত্র সৈন্য আর শস্তা কাপড়ে বোঝাই সিন্দুক নিয়ে তারা সবচেয়ে দূর-দূর বসতিগুলোতে গিয়েও হানা দিচ্ছিলো। সেই ইণ্ডিয়ান মৃগয়ার সবচেয়ে কঠিন অংশ ছিলো মেয়েদের বিশ্বাস করানো : মেয়েরা ঐশ্বরিক শ্রী বা আশীর্বাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করছিলো এই সত্যি যুক্তিটা দেখিয়ে যে মরদরা, যারা দু-ঠ্যাং ছড়িয়ে সারাক্ষণ দোলখাটিয়ায় ঘুমোয়, মনে করে উপপত্নী-দের চাইতে বৈধ পত্নীদের কাছ থেকেই তারা আরো হাড়ভাঙা খাটুনি দাবি করতে পারে। তাদের মন ভোলাবার জন্যে জরুরি হ'য়ে পড়লো ছলকৌশল : তাদের নিজেদের ভাষায় ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে চিনির পানায় গুলে দেয়া জরুরি হ'লো যাতে কথাগুলো খুব রুক্ষ না-শোনায়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে

দমফাটা ছলচাতুরীবাজ সে শুদ্ধ বিয়েয় বিশ্বাস ক'রে বসলো একজোড়া ঝকমকে কানের দুল দেখেই। মরদদের, অন্যদিকে, একবার যখন মেয়েদের সম্মতি আদায় করা হ'য়ে গেলো, রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে এক-এক ক'রে তোলা হ'লো তাদের দোলখাটিয়া থেকে, বাঁধা হ'লো তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে, চাপানো হ'লো ট্রাকের পেছনে যাতে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তাদের বিয়ে দেয়া যায়।

কয়েকদিন ধ'রেই ঠাকুমা দেখছিলেন ছোট্ট ট্রাকটা বোঝাই ক'রে গর্ভবতী ইণ্ডিয়ান মেয়েদের আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু সুযোগটা তিনি গোড়ায় ধরতেই পারেননি। ধরতে পারলেন শুধু পেণ্টেকস্টের রবিবারটায়, যখন তিনি দেখলেন বাজি ফাটছে হাউই উড়ছে ঘণ্টা বাজছে আর দেখতে পেলেন দুর্দশা আর হুল্লোড়ে ভরা একটা ভিড় যেটা পাঁই-পাঁই ক'রে উৎসবের দিকে ছুটেছে, আর তিনি দেখতে পেলেন মুখে ঝালর লাগানো ওড়না আর মাথায় নববধূর টোপর প'রে ভিড়ের মধ্যে রয়েছে একদল গর্ভবতী মেয়ে, ধ'রে আছে তাদের সাময়িক পুরুষ সঙ্গীর বাহু, যাদের সঙ্গে তারা বৃন্দ বিবাহ মারফৎ বৈধ সম্পর্ক পাতাবে।

মিছিলটার সব শেষে যাচ্ছিলো এক কিশোর, অপাপবিদ্ধ হৃদয়, লাউয়ের খোলের মতো ক'রে কাটা ইণ্ডিয়ান চুল তার, গায়ে ছেঁড়া কাপড়, হাতে রেশমি ফিতে লাগানো ঈস্টারের এক মোমবাতি। ঠাকুমা তাকে ডাক দিলেন।

'বাছা, আমাকে শুধু এই কথাটা বলো,' তাঁর সবচেয়ে মসৃণ স্বরে শুধোলেন ঠাকুমা, 'এ-ব্যাপারটায় তোমার ভূমিকাটা ঠিক কী।'

মোমবাতিটাই ছেলেটিকে কেমন ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলো, আর তার গাধার মতো দাঁতের জন্যে তার পক্ষে মুখ বোজাও সম্ভব হচ্ছিলো না।

'পুরুৎরা আমাকে প্রথম খ্রিষ্টিয় ভোজ দেবে,' সে বললে।

'কত টাকা দিয়েছে ওরা ?'

'পাঁচ পেসো।'

ঠাকুমা তাঁর বটুয়া থেকে একতাড়া নোট বার করলেন। ছেলেটি অবাক হ'য়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আমি দেবো কুড়ি পেসো,' বললেন ঠাকুমা, 'তোমার ঐ প্রথম খ্রিষ্টিয় প্রার্থনা-ভোজের জন্যে নয়, তোমাকে টাকা দেবো বিয়ে করার জন্যে।'

'কাকে ?'

'আমার নাৎনিকে।'

এইভাবেই আশ্রমের উঠোনে সন্নেসিনির ঢোলা আলখিল্লা আর একটা

রেশমি শাল প'রে—এটা তাকে দিয়েছিলো নবীশরা—এরেন্দিরার বিয়ে হ'লো, ঠাকুমা তার জন্যে যে-বর কিনেছেন তার নামটা অব্দি না-জেনেই। নিশ্চল জলন্ত সূর্যের তলায় দুশো গর্ভবতী নববধূর গায়ের ছাগীগন্ধের মধ্যে টালমাটাল আশায় সে শোয়ার জমির ওপর নতজানু হ'য়ে বসার যন্ত্রণাটা সহ্য করলে। লাতিনে হাতুড়ি-পেটা ক'রে শোনানো হ'লো সান পাবলোর চিঠির শান্তিতালিকা, কারণ আশ্রমিকেরা খুঁজেই পায়নি এই অদৃষ্টপূর্ব বিয়ের চলনাজালকে ঠেকাবে কী ক'রে। তবে শেষ চেষ্টা হিশেবে তারা তাকে আশ্রমে রেখে দেবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। সেই সামরিক পুরপিতা যে মেঘকে তাগ ক'রে গুলি ছোঁড়ে, ধর্মপ্রচারের প্রধান অধ্যক্ষ, তার আনকোরা স্বামী আর তার ভাবলেশহীন ঠাকুমা—এদের উপস্থিতিতে এরেন্দিরার বিয়ে হ'য়ে গেলো; আবার এরেন্দিরা নিজেকে আবিষ্কার করলে সেই মায়াপাশে বন্দিনী যা তাকে আজন্ম চালিয়ে নিয়ে আসছে। যখন তারা তাকে জিগেশ করলে তার স্বাধীন, সুনিশ্চিত, সত্যিকার অভিপ্রায়টা কী, সে একফোঁটাও দ্বিধা দেখালে না।

'আমি চ'লে যেতে চাই,' সে বললে। আর সে আঙুল তুলে তার স্বামীকে দেখিয়ে ব্যাপারটা আরো প্রাঞ্জল ক'রে তুললো। 'তবে এর সঙ্গে নয়—আমার ঠাকুমার সঙ্গে।'

...

তার বাবার নারঙ্গ বন থেকে একটা কমলালেবু চুরি করার চেষ্টায় উলিসেস একটা আস্ত বিকেলই নষ্ট ক'রে ফেললে। কারণ যখন তার অসুখে-ভোগা গাছগুলো ছাঁটছিলো তার বাবা তার ওপর থেকে একবারও নজর সরাননি, তাছাড়া বাড়ির ভেতর থেকে সারাক্ষণ সজাগ তাকিয়েছিলেন তার মা। তাই সে তার মৎলবটাই ছেঁটে ফেললে, অন্তত সেদিনকার মতো; আর ভেতরে-ভেতরে গজগজ করতে-করতেই বাবাকে সাহায্য ক'রে গেলো সে, যতক্ষণ-না তারা শেষ নারঙ্গগাছটার পাতা-টাতা ছেঁটে ফেললে। নারঙ্গকুঞ্জটা বিশাল, লুকোনো, চুপচাপ; আর কাঠের বাড়ি, টিনের চাল, জানলায় তামার জাফরি আর খুঁটির ওপর উঁচু ক'রে দাঁড় করানো মস্ত একটা পাতিও; আদিম সব উদ্ভিদ লতাপাতায় যেখানে প্রখর তীব্র সব ফুল ফুটে আছে। উলিসেসের মা পাতিওয় একটা ভিয়েনায়-তৈরি দোল-কেদারায় হেলান দিয়ে ব'সে ছিলেন, মাথাধরা সারাবার জন্যে কপালে ধূমায়িত সব লতাপাতা, আর তাঁর সতেজ ইণ্ডিয়ান চাউনি কোনো অদৃশ্য আলোর রশ্মির মতো ছেলেকে অনুসরণ ক'রে বেড়াচ্ছিলো কমলাবনটার সুদূরতম কোণটা পর্যন্ত।

উলিসেসের মা বেশ সুন্দরী, স্বামীর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোটো, আর তিনি যে এখনও তাঁর উপজাতীয় পোশাক পরেন তা-ই নয়, তিনি তাঁর রক্তের সবচেয়ে প্রাচীন কুহেলিগুলোও জানেন।

গাছ-ছাঁটার কাঁচি-টাচি নিয়ে উলিসেস যখন বাড়ি ফিরলো, তার মা তাকে তাঁর বেলা চারটের ওষুধ এনে দিতে বললেন—কাছেই একটা টেবিলে ছিলো সে-ওষুধ। যেই সে তাদের ছুঁলো, গেলাশ আর শিশি তাদের রং পালটে ফেললো। তারপর, শুধু খেলার ছলেই, সে টেবিলের ওপর কতগুলো কাচের বাটির পাশেই যে কাচের কুঁজোটা ছিলো সেটা ছুঁলো আর অমনি তারও রং নীল হ'য়ে গেলো। মা ওষুধ খেতে-খেতে ছেলেকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করলেন, তারপর যখন বুঝলেন যে এ তাঁর কোনো বিকারের ঘোর নয়, তখন তাকে তিনি গুয়াহিরা ইণ্ডিয়ান ভাষায় জিগেশ করলেন:

'কতদিন ধ'রে তোর এ-রকম হচ্ছে?'

'সেই যখন আমরা মরুভূমি থেকে ফিরে এলাম তখন থেকেই,' উলিসেস বললে, তেমনি গুয়াহিরা ভাষায়। 'এ শুধু হয় কাচের জিনিশ ছুঁলেই।'

দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার জন্যে সে টেবিলের ওপর যত বাটি-গেলাশ ছিলো সব এক-এক ক'রে ছুঁলো আর তারা সব নানান রঙে ঝলমল ক'রে উঠলো।

'ও-রকম হয় শুধু প্রেমে পড়লেই,' তার মা বললেন। 'কে সে?'

উলিসেস কোনো উত্তর দিলে না। তার বাবা—তিনি আবার গুয়াহিরা ভাষা বোঝেন না—তখন একরাশ কমলা নিয়ে পাতিওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

'কী বলছিস তোরা দুজনে?' তিনি জিগেশ করলেন উলিসেসকে, ওলন্দাজ ভাষায়।

'বিশেষ কিছুই না,' উলিসেস উত্তর দিলে।

বাবা যখন বাড়ির ভেতরে চ'লে গেলেন তখন তিনি ক্ষণিকের জন্যে উলিসেসের চোখের আড়াল হ'য়ে গিয়েছিলেন, তবে সে তাঁকে একটু পরেই আপিশঘরের মধ্যে দেখতে পেলে, একটা জানলা দিয়ে। যতক্ষণ-না ছেলের সঙ্গে একা হলেন মা অপেক্ষা ক'রে ছিলেন, তারপর আবার জিগেশ করলেন:

'কে সে, বল আমায়।'

'ও কেউ-না,' উলিসেস বললে।

উলিসেস উত্তর দিয়েছিলো একেবারেই আনমনাভাবে, কারণ বাবা আপিশ-ঘরে কী করেন না-করেন প্রতিটি খুঁটিনাটি নড়াচড়া সে অধীরভাবে লক্ষ করছিলো।

যখন তিনি নম্বর ঘুরিয়ে সিন্দুকের তালা খুললেন তার আগে কমলাগুলো তিনি সিন্দুকের ওপর রেখেছিলেন। কিন্তু সে যখন অপলকে তার বাবার ওপর নজর রাখছে তার মা তখন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিলেন।

'অনেকদিন তুই কোনো রুটি খাসনি,' মন্তব্য করলেন তার মা।

'রুটি আমার ভাল্লাগে না।'

সচরাচর যা হয় না, তা-ই হ'লো : মা-র মুখ হঠাৎ কেমন সজীব হ'য়ে উঠলো। 'মিছে কথা,' তিনি বললেন। 'রুটি তুই খাস না কারণ তুই প্রেমে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিস—আর যারা প্রেমরোগে ভোগে তারা রুটি খেতে পারে না।' তাঁর গলার স্বরও, তাঁর চোখের মতোই, অনুনয় থেকে ভয় দেখাবার মতো সতেজ হ'য়ে উঠলো।

'সে কে, আমাকে যদি বলতিস, তাহ'লে ভালো হ'তো,' তিনি বললেন, 'না-হ'লে আমি তোকে মন্ত্রপড়া জলে স্নান করাবো—যাতে তোর এই দশা কেটে যায়।'

আপিশঘরে ওলন্দাজ সিন্দুক খুললেন, কমলাগুলো রাখলেন ভেতরে, তারপর আবার সাঁজোয়া ডালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। উলিসেস তখন জানলা থেকে স'রে এসে অধীর গলায় তার মাকে উত্তর দিলে :

'তোমায় তো বলেইছি ও কেউ-না,' সে বললে। 'যদি তোমার বিশ্বাস না-হয়, বাবাকে জিগেশ কোরো।'

ওলন্দাজ তাঁর আপিশঘরের দরজায় তাঁর খালাশির পাইপটা জ্বালতে-জ্বালতে আবির্ভূত হলেন, তাঁর বগলে জরাজীর্ণ এক বাইবেল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে এস্পানিওলে জিগেশ করলেন :

'মরুভূমিতে তোমাদের সঙ্গে কার দেখা হয়েছিলো?'

'কারু সঙ্গে না,' তাঁর স্বামী উত্তর দিলেন, কিছুটা যেন মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। 'আমাকে যদি বিশ্বাস না-হয়, উলিসেসকে জিগেশ কোরো।'

যতক্ষণ-না সব তামাক পুড়ে গেলো পাইপটা চুষতে-চুষতে তিনি হলঘরটার শেষপ্রান্তে ব'সে রইলেন। তারপর তিনি এলোপাথারি খুললেন তাঁর বাইবেল, আর দু-ঘণ্টা ধ'রে প্রবহমান ঝমঝমে ওলন্দাজ ভাষায় দাগ-দেয়া অংশগুলো প'ড়ে গেলেন।

মাঝরাতেও উলিসেস এমন তীব্রভাবে চিন্তা করছিলো যে সে ঘুমুতেই পারছিলো না। আরো একঘণ্টা সে তার দোলখাটিয়ায় ছটফট ক'রে এপাশ-ওপাশ করলে : স্মৃতির বেদনাকে জয় ক'রে নেবার চেষ্টা করছে সে; কিন্তু শেষটায় এই

বেদনাই তাকে এমন শক্তি দিলে যে সে তার মন স্থির ক'রে ফেললে। তারপর সে প'রে নিলে তার গাউচো পাৎলুন, পশমি ঢিলে জামা, আর তার ঘোড়ায় চড়ার বুটজুতো, তারপর লাফিয়ে নামলে জানলা দিয়ে, পাখি বোঝাই ট্রাকটা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলো। নারঙ্গবনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সে তিনটে টশটশে পাকা কমলা তুলে নিলে—বিকেলবেলায় সে এগুলো চুরি করতে পারেনি।

বাকি রাতটা সে ছুটলো মরুভূমির মধ্য দিয়ে, আর ভোরবেলায় শহর ও গ্রামগুলোয় জিগেশ করতে শুরু করলে এরেন্দিরার শুলুকসন্ধান, কিন্তু কেউই তাকে কোনো খবর দিতে পারলে না। শেষটায় কারা যেন তাকে পাত্তা দিলে যে সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেসের নির্বাচনী অভিযানের দলটার সঙ্গে সে ভ্রমণ করছে, আজ হয়তো সেনাদোর সান্‌চেস আছেন হুয়েভা কাস্তিইয়ায়। উলিসেস কিন্তু তাঁকে সেখানে পেলে না, পেলে বরং তার পরের শহরে, এবং এরেন্দিরা এখন আর তাঁদের সঙ্গে নেই, কারণ ঠাকুমা শেষ অব্দি সেনাদোরকে তাঁর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে নিজের হাতে চিঠি লিখতে রাজি করিয়েছেন, আর সেই চিঠিটা দেখিয়ে তিনি এখন মরুভূমির সবচেয়ে শক্ত খিল-হুড়কো লাগানো দরজা উদ্বোধন করতে চলেছেন। তৃতীয়দিনে উলিসেসের দেখা হ'লো ডাকহরকরার, সেই যে-ছোকরা অন্তর্দেশীয় চিঠিপত্র বিলি ক'রে বেড়ায়, আর ডাকহরকরাই তাকে বললে কোন দিকে যেতে হবে।

'ওরা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে,' ডাকহরকরা বললে, 'আর তুমি বরং একটু তাড়াই কোরো, কারণ যমেরও অরুচি ঐ বুড়ি মৎলব এঁটেছে সমুদ্র পেরিয়ে আরুবা দ্বীপে যাবে।'

সেই দিকনির্দেশ অনুসরণ ক'রে, আদ্ধেকটা দিন পথ চলবার পর, উলিসেস দেখতে পেলে চওড়া দাগে-ভরা তাঁবুটা ঠাকুমা যেটা দেউলে-হ'য়ে-যাওয়া একটা সার্কাসের দলের কাছ থেকে কিনেছেন। ভবঘুরে সেই ছবিওলা আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে, এখন সে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে যে জগৎ সত্যিই অতটা বড়ো নয় যেমন সে একদিন ভেবেছিলো, আর সে জমিয়ে বসিয়েছে তার রাখালিয়া দৃশ্যপট তাঁবুর খুব কাছেই। পেতলের শিঙা ফুঁকে বাজনদারদের একটা দল এরেন্দিরার খদ্দেরদের যুদ্ধ ক'রে রেখেছে, প্রায় মৌন একটা ভালজ বাজিয়ে।

উলিসেস, ভেতরে যাবার জন্যে, অপেক্ষা করলে কখন তার পালা আসে; আর প্রথম যে-জিনিশটা তার নজরে এলো সেটা হ'লো তাঁবুর ভেতরের শৃঙ্খলা : সব পরিপাটি গোছানো, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ঠাকুমার খাটুলি আবার ফিরে

পেয়েছে তার লাটসাহেবি জাঁকজমক ও মহিমা, দেবদূতের মূর্তিটা যথাস্থানে বসানো —আমাদিসদের হাড়গোড়ে-ভরা তোরঙ্গ দুটির পাশে, অধিকন্তু আছে রাং ঝালাই করা একটা স্নানের টব, সিংহের পায়ের ওপর সেটা দাঁড় করানো। তার আনকোরা চাঁদোয়া খাটানো বিছানায়, এরেন্দিরা শুয়ে আছে ন্যাংটো আর শান্ত স্থির, তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে যে-আলো চুঁইয়ে পড়ছে তাতে তাকে দেখাচ্ছে সে যেন শিশুদের মতো লাবণ্য বিকিরণ করছে। চোখ খুলেই সে ঘুমুচ্ছে। উলিসেস তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে, হাতে তার নারঙ্গগুলো, আর সে দেখতে পেলে যে এরেন্দিরা তাকে দেখছে না অথচ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তখন সে তার চোখের ওপর তার হাতের পাতা নাড়ালে, ডাকলে তাকে সেই নামে যে-নামটা সে বানিয়ে নিয়েছে যখনই তার ইচ্ছে হয় এরেন্দিরার কথা ভাবতে :

'রান্দিরেএ !'

এরেন্দিরা জেগে উঠলো। উলিসেসের সামনে নিজেকে কেমন নগ্ন লাগলো তার, একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সে একটা চাদর দিয়ে গলা অব্দি ঢেকে ফেললে।

'তাকিয়ো না আমার দিকে,' এরেন্দিরা বললে, 'আমি বীভৎস !'

'তোমার সারা গায়ে নারঙ্গের রং,' বললে উলিসেস। সে তার চোখের সামনে কমলাগুলো তুলে ধরলে যাতে এরেন্দিরা নিজেই তুলনা ক'রে নিতে পারে। 'এই ছাখো।'

এরেন্দিরা চোখের থেকে হাত সরালে, দেখতে পেলে যে সত্যি তার গায়ের রং কমলার মতোই।

'আমি চাই না যে তুমি এখন থাকো,' সে বললে।

'আমি শুধু তোমাকে এটা দেখাতেই এসেছি,' বললে উলিসেস। 'চেয়ে ছাখো, এখানে।'

সে তার নখ দিয়ে একটা নারঙ্গের খোশা ছাড়ালে, তারপর হাতের চাপে সেটা ভেঙে দু-আধখানা করলে, আর ভেতরে কী আছে সেটা দেখালে এরেন্দিরাকে : নারঙ্গটার ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত খাঁটি হিরে।

'এই নারঙ্গগুলোই আমরা সীমান্ত পেরিয়ে নিয়ে যাই,' সে বললে।

'কিন্তু এরা তো সত্যিকার নারঙ্গ—গাছে-হওয়া !' এরেন্দিরা, চমকে গিয়ে, বললে।

'নিশ্চয়ই।' উলিসেস মুচকি হাসলে। 'এগুলো আমার বাবা ফলান।'

এরেন্দিরা তা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না। সে তার চোখের ঢাকা সরিয়ে হিরেটা আঙুলে ধ'রে অবাক হ'য়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'এ-রকম তিনটে হ'লেই আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবো,' বললে উলিসেস।

হতাশ তাকিয়ে এরেন্দিরা তাকে হিরেটা ফিরিয়ে দিলে। উলিসেস ব'লেই চললো :

'তাছাড়া আমার সঙ্গে একটা মাল-বওয়া ট্রাক আছে,' জানালে সে। 'আর তাছাড়া···ছাখো !'

জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে বার ক'রে আনলে একটা শাবেক আমলের পিস্তল।

'দশ বছরের আগে আমি কোথাও যেতে পারবো না,' বললে এরেন্দিরা।

'তুমি যাবে,' বললে উলিসেস। 'আজ রাতে, যখন ঐ শাদা তিমি ঘুমিয়ে পড়বে, আমি বাইরে থাকবো, প্যাঁচার মতো ডাক দেবো।'

সে এমন চমৎকার নকল ক'রে প্যাঁচার ডাক শোনালে যে ঠিক মনে হয় যেন সত্যি প্যাঁচার ডাক, আর তা শুনে এই প্রথম এরেন্দিরার চোখ দুটি মৃদু হাসলো।

'উনি আমার ঠাকুমা,' সে বললে।

'কে ? প্যাঁচা ?'

'না। তিমি।'

ভুলটায় দুজনেই হেসে উঠলো, কিন্তু এরেন্দিরা পরক্ষণেই কথার জের তুলে নিলে।

'তার ঠাকুমার অনুমতি বিনা কেউ কোথাও—কোনোখানেই—যেতে পারে না।'

'সে-কথাটা ওঁকে বলবার কোনো কারণ নেই।'

'সে উনি যে-ক'রেই হোক জেনে যাবেন,' বললে এরেন্দিরা। 'উনি সবকিছুই স্বপ্নে দেখতে পান।'

'যখন উনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন তুমি চ'লে যাচ্ছো, ততক্ষণে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে যাবো। আমরা সীমান্ত পেরুবো চোরাচালানিদের মতো।'

সিনেমার তুখোড় বন্দুকবাজদের মতো আত্মবিশ্বাস নিয়ে, পিস্তলটা বাগিয়ে, সে নকল ক'রে শোনালে গুলির আওয়াজ টিশুম-টিশুম, যাতে তার বেপরোয়া ভাব দেখে এরেন্দিরা তেতে ওঠে। এরেন্দিরা হ্যাঁও বললে না, নাও বললে না, তবে তার চোখ দুটো যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে একটা চুমু খেয়ে উলিসেসকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে। উলিসেস, একেবারে গ'লে গিয়ে, ফিশফিশ ক'রে বললে :

'কাল আমরা দেখতে পাবো জাহাজগুলো কেমন ক'রে জল কেটে চ'লে যায়।'

সে-রাত্তিরে, সন্ধে সাতটার একটু পরে, এরেন্দিরা তার ঠাকুমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলো, যখন আবার তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া শন-শন বইতে শুরু ক'রে দিলে। তাঁবুর আশ্রয়ে ছিলো ইণ্ডিয়ান বেহারারা আর সেই পেতলের বাজনাদার দলের সর্দার: মাইনের জন্যে অপেক্ষা করছিলো তারা। ঠাকুমা হাতের কাছে যে-বাক্সটা ছিলো তা থেকে নোটগুলো তুলে নিয়ে গোনা শেষ করলেন, তারপর হিশেবের জাবদা খাতাটা দেখে তিনি সবচেয়ে বুড়ো ইণ্ডিয়ানের পাওনা চুকিয়ে দিলেন।

'এই-যে, তোমার টাকা,' তিনি তাকে বললেন। 'কুড়ি পেসো হপ্তা—তা থেকে আট বাদ যাবে খোরাকি, তিন বাদ যাবে জলের জন্যে, পঞ্চাশ সেণ্ট কাটা যাবে নতুন জামার জন্যে, তার মানে সাড়ে-আট। নাও, গুনে নাও।'

বুড়ো ইণ্ডিয়ান টাকা গুনে নেবার পর তারা সবাই সেলাম ঠুকে বাইরে চ'লে গেলো।

'ধন্যবাদ, শাদা মেমসাব।'

তারপর এলো বাজনদারদের সর্দার। ঠাকুমা হিশেবের খাতা দেখলেন, ছবিওলার দিকে তাকালেন—সে তখন তার ক্যামেরার হাপর সারাবার চেষ্টা করছে দলা-দলা গাটাপার্চা দিয়ে।

'এই ব্যাপারটা কী হবে?' ঠাকুমা তাকে জিগেশ করলেন। 'বাজনার জন্যে তুমি সিকিভাগ দেবে, কি দেবে না?'

'ছবির মধ্যে তো কোনো গান আসে না।'

'কিন্তু গান বাজে ব'লেই লোকের ছবি তোলাতে ইচ্ছে করে,' ঠাকুমা উত্তর দিলেন।

'বরং উল্‌টো হয়,' তসবিরওলা বললে। 'গান তাদের মনে করিয়ে দেয় যারা মারা গেছে, আর তারপর তারা ছবিতে ফুটে ওঠে চোখ বোজা।'

বাজনদারদের সর্দার বাধা দিলে।

'তারা যে চোখ বোজে সে কিন্তু গানের জন্যে নয়,' সে বললে। 'রাত্তিরে ছবি তোলবার সময় তুমি যে বিজলির ঝিলিক বানাও তাতেই তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।'

ছবিওলা তবু জোর দিয়ে বললে: 'উঁহু, সে হয় গানের জন্যে।'

ঠাকুমা এই ঝগড়ার নিষ্পত্তি করলেন। 'মক্ষিচুষ হোয়ো না,' তিনি বললেন ছবিওলাকে, 'ছাখো, দেনাদোর ওনোদিমো সানচেদের জন্যে কী ভালোই না

চলেছে সবকিছু—চুটিয়ে ছবি তুলছো তুমি—আর সে তো তাঁর সঙ্গে বাজনদারের দল আছে ব'লেই।' তারপর, রুক্ষ স্বরে, তিনি শেষ করলেন:

'কাজেই যা তোমার দেয়া উচিত, মিটিয়ে দাও, আর নয়তো তোমার কপাল তোমারই—নিজের পথ নিজেই দেখে নাও। ঐ বাচ্চা মেয়েটা পুরো খাই-খরচার বোঝা শুধু একা নিজের কাঁধে তুলে নেবে, এ ঠিক নয়।'

'আমার কপাল আমিই বুঝবো,' ছবিওলা বললে। 'আমি তো আসলে একজন শিল্পী কিনা।'

ঠাকুমা অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাজনদারদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিলেন। একতাড়া নোট তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁর হিশেবের খাতার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন।

'দুশো চুয়ান্নটা গানের সুর,' তিনি তাকে বললেন। 'সুর পিছু পঞ্চাশ সেণ্ট ক'রে, তার সঙ্গে যোগ হবে রোববারে বত্রিশ আর ছুটির দিনে সুর পিছু ষাট সেণ্ট—একুনে একশো ছাপ্পান্ন পেসো কুড়ি সেণ্ট।'

বাজনদার কিছুতেই সে-টাকা নেবে না।

বললে, 'সব শুদ্ধ একশো বিরাশি পেসো চল্লিশ সেণ্ট হবে। ভাল্‌জের দাম আরো বেশি।'

'তা কেন হবে?'

'কারণ তাদের সুর আরো করুণ,' বাজনদার বললে।

ঠাকুমা তাকে টাকাটা নিতে বাধ্য করলেন।

'বেশ, এ-হপ্তায় তাহ'লে প্রতি ভাল্‌জের সঙ্গে দুটো ক'রে আহ্লাদের সুর বাজাবে—তাহ'লেই আমাদের শোধবোধ হ'য়ে যাবে।'

ঠাকুমার যুক্তি বাজনদারের মাথায় কিছুই ঢুকলো না, তবে মনে-মনে জটটা খোলবার চেষ্টা করতে-করতে সে অঙ্কটা মেনে নিলে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভয়াল বাতাস তাঁবুটাকেই উপড়ে নেবার ভয় দেখালো, আর বাতাস তার পেছনে যে-স্তব্ধতা রেখে গেলো, তার মধ্যে বাইরে স্পষ্ট, করুণ, একটা প্যাঁচার ডাক শোনা গেলো।

সে যে ঘাবড়ে গেছে, এটা লুকোবার জন্যে এরেন্দিরা যে কী করবে তা ভেবেই পেলে না। সে টাকার বাক্সের ডালা বন্ধ ক'রে সেটা খাটুলির তলায় ঢুকিয়ে দিলে, কিন্তু তার হাতে চাবির গোছা তুলে দেবার সময় ঠাকুমা তার হাতের ভয়ের ভাষা ঠিক প'ড়ে ফেলেছিলেন। 'ভয় পাসনে,' তাকে তিনি বললেন। 'ঝড়ের রাতে প্যাঁচা ডাকে, সবসময়।' তবু সে যে আশ্বস্ত হয়েছে এমন কিন্তু বোঝা

গেলো না, বিশেষত সে যখন দেখলে যে ছবিওলা তার পিঠে ক্যামেরা চাপিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'ইচ্ছে করলে তুমি কাল অব্দি সবুর করতে পারো,' ঠাকুমা বললেন ছবিওলাকে। 'আজ রাত্তিরে মরণ ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ছবিওলাও প্যাঁচার ডাক শুনেছিলো, কিন্তু তার জন্যে সে তার সিদ্ধান্ত পাল্টালে না।

'থেকে যাও, বাছা।' ঠাকুমা চাপ দিলেন। 'তোমাকে যে আমি পছন্দ ক'রে ফেলেছি, অন্তত তার খাতিরেও থেকে যাও।'

'আমি কিন্তু গানের জন্যে কানাকড়িও দেবো না,' ছবিওলা বললে।

'উহু, না,' ঠাকুমা বললেন। 'সে চলবে না।'

'তবেই ভাখো,' ছবিওলা বললে, 'কারু জন্যেই তোমার প্রাণে মায়া-দয়া নেই।'

রাগে ঠাকুমা কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলেন।

'তাহ'লে, যা, ভাগ!' চ'টে উঠলেন ঠাকুমা। 'ভাগ, নিচুমন!'

এতটাই তিনি রেগে গিয়েছিলেন যে এরেন্দিরা যখন তাঁকে বিছানায় শোয়াতে নিয়ে গেলো তখনও তিনি ছবিওলার ওপর ঝাল ঝেড়ে চলেছেন। 'ডাইনি মায়ের বাচ্চা!' ঠাকুমা গজগজ করছিলেন। 'কার মনে কী আছে সে-কথা কী জানে বেজন্মাটা?' এরেন্দিরা তাঁর কথায় কোনো পাত্তাই দিলে না, কারণ হাওয়ার তোড় যেই একটু কমে অমনি প্যাঁচাটা জেদ ধ'রে একগুঁয়ের মতো ডাকে, আর সে-ডাক শুনে এরেন্দিরা যে কী করবে তা ভেবেই পায় না, আর কেবলই ছটফট করে। ঠাকুমা শেষ অব্দি বিছানায় শুলেন, পুরোনো প্রাসাদে শুতে যাবার আগে রোজ যে-পালা হ'তো তারই পুনরাবৃত্তি হ'লো, সেই একই রীতি, আর যখন তাঁর নাৎনি তাঁকে হাওয়া করলো আস্তে-আস্তে তাঁর রাগ প'ড়ে এলো, আর আবার তিনি তাঁর বন্ধ্যা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে শুরু করলেন।

'তোকে সকাল-সকাল উঠতে হবে,' তখন তিনি বললেন, 'যাতে লোকজন আসার আগেই আমার স্নানের জন্যে লতাপাতা সেদ্ধ করতে পারিস।'

'সি, আবুয়েলা।'

'হাতে যা সময় থাকবে, তাতে তুই ইণ্ডিয়ানদের নোংরা কাপড়-চোপড় কেচে নিবি—তাহ'লে আসছে হপ্তায় ওদের মাইনে থেকে আরো টাকা কেটে নেয়া যাবে।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর উটপাখিটাকেও খেতে দিস।'

এরেন্দিরা বললে, 'সি, আবুয়েলা।'

হাতপাখাটা সে শিয়রের কাছে রেখে মৃতদের হাড়গোড়ে ভরা সিন্দুকের সামনে সে দুটো বড়ো পুজোর মোমবাতি জেলে দিলে। ঠাকুমা, এখন ঘুমের ঘোরে, তাঁর হুকুম দেবার ফর্দে পেছিয়ে পড়েছেন।

'আর আমাদিসদের জন্যে মোমবাতি জেলে দিতে ভুলিসনে।'

'সি, আবুয়েলা।'

তখনই এরেন্দিরা বুঝতে পারলে যে ঠাকুমা আর জাগবেন না, কারণ তিনি এতক্ষণে তাঁর প্রলাপ বকতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। সে শুনতে পেলে তাঁবুটাকে ঘিরে হাওয়া গরগর করছে, কিন্তু তবু সে তখনও বুঝতে পারেনি যে এ তারই দুঃসময়ের হাওয়া। সে রাতের দিকে তাকিয়ে রইলো অনিমেষ যতক্ষণ-না আবার ডেকে উঠলো প্যাঁচা আর মুক্তির জন্যে তার যে-সহজাত অনুভূতি সেটাই শেষ-কালে তার ঠাকুমার কুহকের ওপর জিতে গেলো।

তাঁবু থেকে সে পাঁচ পা বেরিয়েছে কি বেরোয়নি সে ছবিওলার মুখোমুখি এসে পড়লো, ছবিওলা তখন তার সাইকেলের পিঠে তার সব জিনিশপত্তর চাপাচ্ছে। যেন দুজনে কোনো শলা করেছে গোপনে, এমনিভাবে তাকে দেখে হাসলো ছবিওলা, আর তখন সে একটু শান্ত হ'লো।

'আমি কিছুই জানি না,' ছবিওলা বললে। 'আমি কিছুই দেখিনি। আর আমি গানের জন্যেও কোনো পয়সা দেবো না।'

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সে বিদায় নিলে। আর তখন এরেন্দিরা ছুটে গেলো মরুভূমিতে, চিরকালের মতো সে মনস্থির ক'রে ফেলেছে, একবারেই, আর যেখান থেকে প্যাঁচা ডাকছিলো, সেখানকার হাওয়ার ছায়ারা তাকে গিলে ফেললো।

সেবারে ঠাকুমা সঙ্গে-সঙ্গেই বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে হাজির। স্থানীয় দফতরের সিপাহসালার সকাল ছ-টার সময় লাফিয়ে নামলে তার দোলখাটিয়া থেকে যখন ঠাকুমা তার চোখের সামনে মেলে ধরলেন সেনাদোরের চিঠি। উলিসেসের বাবা দরজার কাছে অপেক্ষা করছিলেন।

'চিঠিতে কী লেখা আছে, তা আমি কোন জাহান্নাম থেকে জানবো?' সিপাহসালার চ্যাঁচালে। 'আমি পড়তেই পারি না।'

ঠাকুমা বললেন, 'এটা সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেসের লেখা অনুমোদনপত্র।'

আর-কোনো প্রশ্ন না-তুলেই সিপাহশালার তার দোলখাটিয়ার পাশে যে-

রাইফেলটা প'ড়ে ছিলো সেটা তুলে নিলে আর গাঁক-গাঁক ক'রে তার লোকদের হুকুম দিতে শুরু করলে। পাঁচ মিনিট পরে তারা একটা পলটনের ট্রাকে চেপে সীমান্তের দিকে উড়ে চললো, এমনকী বিরুদ্ধ হাওয়াকে কেটেই, উল্টো দিক থেকে বওয়া যে-হাওয়া পলাতকদের সব চিহ্ন মুছে ফেলেছে। সিপাহসালার বসেছে সামনে, চালকের পাশের আসনে। পেছনে বসেছেন ওলন্দাজ আর ঠাকুমা, আর ছ-চারের পাদানিতে একজন ক'রে সশস্ত্র পুলিশ।

শহরের কাছে এসে তারা বর্ষাতি-ঢাকা ট্রাকের একটি বহর থামালে। পেছনে কয়েকজন লোক লুকিয়ে যাচ্ছিলো, তারা কেম্বিস কাপড়ের তেরপল তুলে ছোটো গাড়িটাকে তাগ ক'রে মেশিনগান আর ফৌজি রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো। প্রথম ট্রাকের চালককে সিপাহসালার জিগেশ করলে পাখিবোঝাই একটা খামারের ট্রাক তারা কত পেছনে রেখে এসেছে।

উত্তর দেবার আগেই চালক গাড়ি ছাড়লো।

'আমরা গোয়েন্দা কবুতর নই,' ঘেন্নায় সে ঠোঁট বেঁকালে। 'আমরা চোরা-চালান করি।'

সিপাহসালার দেখতে পেলে মেশিনগানগুলোর কালিঝুলি মাখা নল তার চোখের পাশ দিয়ে চ'লে গেলো আর সে হাত তুলে আত্মসমর্পণ ক'রে মিটিমিটি হাসলে।

'অন্তত,' সে তাদের উদ্দেশে চ্যাঁচালে, 'তোমাদের এটুকু শোভনতাবোধ থাকা উচিত ছিলো যে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ক'রে যেতে নেই।'

শেষ ট্রাকের পেছনে, বাষ্পারের গায়ে, লেখা : তো মা র ক থা ই আ মি ভা বি, এ রে দি রা।

যত তারা উত্তরমুখো চলেছে হাওয়া ততই শুকনো খরখরে হ'য়ে উঠছে, আর হাওয়ার চাইতেও বেশি খেপে গিয়েছে রোদ্দুর। ঘেরা ট্রাকটার মধ্যে গরম আর ধুলোবালির জন্যে শ্বাস নেয়াও কঠিন।

ছবিওলাকে প্রথমে দেখতে পেলেন ঠাকুমাই : যেদিকটায় তাঁরা উড়ে যাচ্ছেন সেদিকটাতেই জোরে সাইকেল চালিয়ে ছবিওলা চলেছে। মাথায় শুধু একটা বান্দানা জড়ানো, তাছাড়া রোদ্দুর থেকে বাঁচবার আর-কোনো উপায়ই নেই তার।

'ঐ-যে, ও!' আঙুল তুলে দেখালেন ঠাকুমা। 'ঐ হতচ্ছাড়া নিচু জাতই ওসের লোক!'

পাদানির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা সেপাইদের একজনকে সিপাহসালার বললে ছবিওলার দায়িত্ব নিতে।

'ওকে পাকড়ে নিয়ে এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোরো,' সিপাহসালার বললে। 'আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

সেপাই চলতি ট্রাকের পাদানি থেকে লাফিয়ে নেমে দু-দুবার চেঁচিয়ে থামতে বললে ছবিওলাকে। উলটো দিক থেকে হাওয়া বইছিলো ব'লে ছবিওলা তাকে শুনতে পায়নি। ট্রাক যখন তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো ঠাকুমা তার দিকে হেঁয়ালি-ভরা একটা ইশারা করলেন, কিন্তু সে সেটাকে ভুল ভাবলে সম্ভাষণ ব'লে, আর সে হেসে হাত নেড়ে তার জবাব দিলে। গুলির আওয়াজ সে শুনতে পায়নি। হাওয়ায় সে পৎপৎ উড়লো একবার, তারপর, মড়া, ধপ ক'রে পড়লো তার সাইকেলের ওপরেই, রাইফেলের গুলিতে ধড় থেকে মুণ্ডুটা উড়ে গিয়েছে : সে জানতেও পারেনি গুলিটা এসেছিলো কোথেকে।

দুপুরের আগেই তারা ছড়ানো পালক দেখলো এদিক-ওদিক। হাওয়ায় উড়ে আসছে তারা, কচি-কচি সব পাখির পালক। ওলন্দাজ তাদের দেখেই চিনতে পারলেন, কারণ এগুলো তাঁরই পাখির পালক, হাওয়া তাদের খাবলে-খুবলে উপড়েছে। চালক দিক পালটালে, প্যাডেলে পা চেপে সব তেল পাঠিয়ে দিলে এনজিনে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা দিগন্তের কাছে দেখতে পেলে মাল-বওয়া ট্রাকটাকে।

পেছন দেখবার আয়নায় ফৌজি গাড়িটা আসছে দেখেই উলিসেস চেষ্টা করলে দুই গাড়ির মধ্যকার ব্যবধান বাড়িয়ে দিতে, কিন্তু তার এনজিনের এর চাইতে বেশি কোনো ক্ষমতা নেই। এককৌটাও না-ঘুমিয়ে এতক্ষণ ধ'রে এসেছে তারা, অবসাদে তেষ্টায় তাদের প্রাণ যায় আর-কি। এরেন্দিরা, উলিসেসের কাঁধে মাথা রেখে ঢুলছিলো, হঠাৎ আঁৎকে জেগে উঠলো। সে দেখতে পেলে ট্রাকটা, সেটা এক্ষুনি তাদের নাগাল ধ'রে ফেলবে, আর সরল নিষ্পাপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় দন্তানার খুপরি থেকে এক হ্যাঁচকা টানে পিস্তলটা বার ক'রে নিয়ে এলো।

'এটা কোনো কাজের নয়,' বললে উলিসেস। 'এটা ছিলো সার ফ্রানসিস ড্রেকের পিস্তল।'

এরেন্দিরা কয়েকবার পিস্তলটা ঠুকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। হাওয়ায় পালক-ওপড়ানো পাখি বোঝাই লজ্‌ঝড় ট্রাকটাকে ফৌজি টহল পেরিয়ে গেলো, তারপর একটা তীক্ষ্ণ মোচড় মেরে ঘুরে গিয়ে তার রাস্তা আটকে দাঁড়ালো।

...

এ-রকম সময়েই আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় হ'য়ে যায়, যেটা ছিলো তাদের সব-চেয়ে জমকালো সময়; কিন্তু আমি হয়তো তাদের জীবনের খুঁটিনাটির দিকে তাকাতুমই না যদি-না অনেক বছর পরে রাফায়েল এস্কালোনা, একটা গানের মধ্যে, এই নাটকটির ভয়াবহ পরিসমাপ্তি উদ্‌ঘাটন ক'রে দিতেন, আর তখনই আমার মনে হ'লো এই কাহনটা ফাঁদা বোধহয় ভালো হবে। তখন আমি রিওআচা প্রদেশে বিশ্বকোষ আর ডাক্তারি বই ফিরি ক'রে বেড়াতুম। আলভারো সেপেদা সামুদিও, সেও তখন ঐ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, বিয়ার ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্রপাতি বেচতে; আর সে আমাকে তার ট্রাকে ক'রে মরুভূমির শহরগুলোয় নিয়ে যেতো, উদ্দেশ্য আমার সঙ্গে কোনোকিছু নিয়ে কথা বলে, কিন্তু আমরা এতই বকবক করেছি—সব বিষয়ে এবং কোনো বিশেষ বিষয়েই নয়—আর এত বিয়ার গিলেছি যে আমরা টেরই পাইনি কখন কিংবা কোথায় আমরা পুরো মরুভূমিটা পেরিয়ে একেবারে সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছি। আর দেখি, ঐ-তো ভ্রাম্যমাণ প্রণয়ের শিবির, তাঁবুর কেম্বিস কাপড়ের গায়ে এই বয়ান লেখা: এরেন্দিরা—সবার সেরা; এখন কাটো, আবার এসো পরে—ঐ অধীরা এরেন্দিরা তোমার তরে সবুর করে; কী অর্থ হয় জীবনে—এরেন্দিরা বিহনে? অন্তহীন ঢেউ-খেলানো সার চ'লে গেছে, কত জাতির কত-যে লোক, সমাজের কত স্তরের পুরুষ, সারটাকে দেখাচ্ছে কোনো সাপের মতো যার মেরুদণ্ডটা মানুষের, ফাঁকা সব জমি আর স্কোয়ারে ঢুলছে, রং-বাহারি সব হাটে-বাজারে কোলাহলে শোরেগোলে, সেই শহরের সমস্ত রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসছে কাতারে-কাতারে লোক, পিলপিল পিলপিল, সেই শহর দিয়ে যাচ্ছে কত-যে ব্যাবসাদার আর তাদের হৈ-হট্টগোল। সব রাস্তাতেই খোলাখুলি জুয়োর আড্ডা, প্রত্যেক বাড়িই শুঁড়িখানা, প্রত্যেক দুয়ারই ফেরারিদের আশ্রয়। কত-যে মানে-বোঝা-যায়-না গান, কত-যে ফিরিওলার বেসাতি নিয়ে হাঁকাহাঁকি, সেই ঘোরজাগানো দুঃস্বপ্ন-দেখানো জলন্ত উত্তাপের মধ্যে সবকিছু মিলে তৈরি ক'রে দিচ্ছে আতঙ্কের একটাই হাহাকার।

সেইসব লোক যাদের নিজের দেশ ব'লে কিছু নেই, সব ফেরেব্বাজ জোচ্চোর বাঁটপাড়ের মেলায় ছিলো সাধু রাকামান, টেবিলের ওপর সটান দাঁড়ানো, জিগেশ করছে কারু কাছে সত্যিকার কোনো সাপ আছে কি না, সাপের বিষের যে-প্রতিষেধক সে আবিষ্কার করেছে নিজের শরীরেই যাতে সেটা পরখ ক'রে দেখাতে পারে। ছিলো এক মেয়ে, যে বদলে গিয়েছিলো মাকড়শায়, শুধু তার মা-বাবার

কথা শোনেনি ব'লেই, পঞ্চাশ সেণ্ট দিলে যে তাকে ছুঁয়ে দেখতে দেয় লোককে, লোকে যাতে বুঝতে পারে এর মধ্যে কোনো জোচ্চুরি নেই, আর যারাই তার এই দুর্দশা নিয়ে প্রশ্ন করতে চায় তাদেরও সে নাকি সব কথার জবাব দেবে। চিরজীবনের মধ্য থেকে এক দূত এসে হাজির, যে ঘোষণা করলে ভয়াল ভয়ংকর ভুতুড়ে বাদুড়ের অত্যাসন্ন আগমনবার্তা, যার জলন্ত গন্ধক আর ঝামায় ভরা নিশ্বাস উলটে দেবে প্রকৃতির সব নিয়মকানুন আর সমুদ্রের সব রহস্যকে যে অতল থেকে নিয়ে আসবে জলের ওপর।

একটাই বিশ্রামে ভরা গুপ্ত 'পশ্চাদ্দেশ' ছিলো শহরের, সেটা লাল আলোর পতিতাপল্লি, শহুরে শোরগোলের শুধু ফুলকিরাই যেখানে গিয়ে পৌঁছোয়। সিন্ধু-গোলাপের চৌকোণ থেকে-আসা স্ত্রীলোকেরা পরিত্যক্ত ক্যাবারের একঘেয়েমিতে শুধু হাই তোলে। তারা ব'সে-ব'সেই ঘুমোয় তাদের সিয়েস্তা, যে-সব লোক তাদের কামনা করেছে অজাগর থেকেছে তাদের কাছে, আর কড়িকাঠ থেকে যে-পাখা ঝোলে তার তলায় তারা অপেক্ষা ক'রে থাকে ভুতুড়ে বাদুড়ের আবির্ভাবের জন্যে। হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন উঠে পড়লো, গেলো একটা অলিন্দে, যেখানে হাঁড়ি-পাতিলে ফুল ফুটে তাকিয়ে আছে নিচে রাস্তার দিকে। নিচে ঐখান দিয়ে এরেন্দিরার অনুরক্তরা চলেছে পিলপিল পিলপিল।

'এসো-এসো,' মেয়েটি চেঁচিয়ে বললে তাদের, 'ওর এমন কী-জিনিশ আছে যা আমাদের নেই?'

'সেনাদোরের কাছ থেকে এক চিঠি,' কেউ-একজন চেঁচিয়ে সাড়া দিলে।

শোরগোল আর হাসির হররা শুনে অন্য মেয়েরা এসে দাঁড়ালে অলিন্দে।

'দিনের পর দিন ধ'রে সারটা এ-রকমই চলেছে,' তাদের একজন বললে, 'শুধু ভাবো পঞ্চাশ পেসো ক'রে একেকজনা।'

প্রথমে যে এসেছিলো, সে মনস্থির ক'রে নিলে:

'বেশ, আমি গিয়ে দেখবো ঐ সাত মাসের বাচ্চার কাছে কোন রতন আছে।'

'আমিও যাবো,' আরেকজন বললে, 'ব'সে-ব'সে চৌকিগুলো বিনিপয়সায় গরম করার চাইতে তা ভালো হবে।'

যাবার পথে অন্য অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, আর যখন তারা গিয়ে এরেন্দিরার তাঁবুতে পৌঁছুলো, ততক্ষণে তারা একটা হল্লাগোল্লা মিছিল বানিয়ে ফেলেছে। কাউকে কিছু না-ব'লেই তারা ভেতরে ঢুকে পড়লো, বালিশ তুলে ছুঁড়ে মারলো যে-লোকটাকে তারা দেখতে পেলে, দেখতে পেলে সে তার টাকা

কীভাবে খরচ করছে, তারপর তারা তুলে নিলে এরেন্দিরার খাটিয়াটা আর একটা খাটুলির মতো ধরাধরি ক'রে সেটা নিয়ে এলো রাস্তায়।

'এ যে দেখি ঘোর দৌরাত্ম্য!' ঠাকুমা একেবারে ফেটে পড়লেন। 'বেইমানের ঝাঁক! দস্যুর দঙ্গল!' আর তারপর সার বেঁধে দাঁড়ানো লোকদের দিকে ফিরে চ্যাঁচালেন: 'আর তোরা, বলি ওরে মরদ-দেখতে মাগির দল, কোথায় তোদের বিচিগুলো, একটা অসহায় শিশুর ওপর এমন হামলা দেখে তোদের লজ্জা হয় না! জাহান্নামের সব চুতিয়া, যত রাজ্যের কটাই-মজুর!'

ঠাকুমা গলা ছেড়ে চ্যাঁচাতেই থাকেন, যদ্দুর যাঁর গলা যায় তদ্দুর, যাকেই কাছে পান ধমাশ ক'রে তাকেই কষান তাঁর দোর্দণ্ডের বাড়ি, কিন্তু ভিড়ের চেল্লা-চিল্লিতে আর রগড়ের সিঁটিতে তাঁর কোনো ফোঁস-ফোঁস রোষই শোনা যাচ্ছিলো না।

এই মক্করা-রগড় থেকে এরেন্দিরা যে পালাতে পারেনি তার কারণ যখন সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো সেদিন থেকেই খাটিয়ার একটা তক্তার ফালির সঙ্গে ঠাকুমা তাকে কুকুর-বাঁধার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। তবে তারা তার কোনো ক্ষতি করলে না। তারা তাকে শুধু প্রদর্শন করলে চাঁদোয়ালাগানো একটা বেদিতে, হট্টগোলে ভরা শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত রাস্তায়, যেন শেকলে-বাঁধা অনুতাপিনীর রূপকেরই একটা স্তবক, আর শেষটায়, গির্জেয় যে-মঞ্চের ওপর কফিন রাখে তেমনি একটা মঞ্চে, শহরের ঠিক মাঝখানে, প্রধান স্কোয়ারটায়, তারা তাকে শুইয়ে রাখলে। এরেন্দিরা একেবারে কুণ্ডলি পাকিয়ে গিয়েছিলো, তার মুখ লুকিয়ে; কিন্তু কাঁদেনি; আর এইভাবেই সে প'ড়ে রইলো স্কোয়ারে, লজ্জায়-ধিক্কারে-রোষে ছিঁড়ে-যাওয়া, ভয়াল সূর্যের তলায় তার অলুফুণে নিয়তির সঙ্গে কুকুর-বাঁধার শেকল দিয়ে বাঁধা—যতক্ষণ-না একজন অন্তত এতটা দয়া করলে যে তাকে একটা জামা দিয়ে ঢেকে দিলে।

সেই একবারই আমি তাদের দেখেছি, তবে পরে আমি জেনেছি যে তারা ঐ সীমান্ত শহরেই থেকে গিয়েছিলো, পৌর সেপাইদের সুরক্ষায়, যতক্ষণ-না ঠাকুমার সিন্দুকগুলো টাকায়-পয়সায় প্রায় ফেটেই পড়ে; আর শুধু তখনই তারা ছেড়ে আসে মরুভূমি, আর ধাওয়া করে সমুদ্রের দিকে। গরিবগুরবোদের মধ্য থেকে এত ধনসম্পদ জড়ো করতে এর আগে কাউকে কখনও দেখা যায়নি। বলদে-টানা গাড়ির একটা মিছিল ছিলো, যার ওপর প্রাসাদের সর্বনাশের পর উদ্ধার-করা টুকিটাকি এটা-ওটার শস্তা নকল বোঝাই ক'রে চাপানো, শুধু রাজকীয় আবক্ষমূর্তি বা দুর্লভ সব ঘড়িই নয়, সেই সঙ্গে ছিলো হাতফেরতা এক পিয়ানো, হাতল-

ঘোরানো একটা ভিকট্রোলা আর পিছুটান-জাগানো সব গানের রেকর্ড। ইণ্ডিয়ান-দের একটা দল দেখাশোনা করে মালপত্রের, আর বাজনদারদের একটা দল গ্রামে-গ্রামে ঘোষণা করে তাদের বিজয় আবির্ভাব।

কাগজের ফুলের মালায় সাজানো একটা খাটুলিতে ক'রে যেতেন ঠাকুমা, তাঁর বটুয়া থেকে মুঠো-মুঠো দানা নিয়ে চিবোতে-চিবোতে, গির্জের একটা চাঁদোয়ার ছায়ায়। তাঁর প্রকাণ্ড গতর প্রকাণ্ডতর হয়েছে এখন, কারণ তাঁর ব্লাউসের তলায় এখন তিনি নৌকোর পাল বানাবার কাপড়ে তৈরি একটা গেঞ্জি পরেন, তার মধ্যে তিনি রাখেন সোনার চাক্তিগুলো, যেমনভাবে লোকে ছোটো-ছোটো খোপওলা বান্দোলিয়ায় কার্তুজ রাখে। এরেন্দিরা থাকতো তাঁর পাশে, রংচঙে পোশাকে সাজা, ঝুমকো গয়নাগুলো ঝুলছে গা থেকে, কিন্তু কুকুর-বাঁধার শেকল এখনও তার হাঁটুতে বাঁধা।

'নালিশ করার কোনোই কারণ নেই তোর,' সীমান্ত শহর ছেড়ে আসবার সময় তার ঠাকুমা তাকে বলেছিলেন। 'রানীর মতো পোশাক-আশাক, বিলাসবৈভবে ভরা একটা বিছানা, একেবারে তোরই নিজস্ব এক রোশনচৌকি, আর সেবার জন্যে খাড়া চোদ্দ-চোদ্দজন ইণ্ডিয়ান। তোর কি তা চমৎকার ব'লে মনে হয় না?'

'সি, আবুয়েলা।'

'যখন তোর জন্যে আর আমি থাকবো না,' ঠাকুমা ব'লেই চলেছিলেন, 'তোকে আর তখন পুরুষের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে কাটাতে হবে না, কারণ তখন কোনো পেল্লায় শহরে তোর নিজের বাড়ি থাকবে। তুই থাকবি স্বাধীন, সুখী।'

এটা অবশ্য ভবিষ্যতের একটা সম্পূর্ণ নতুন আর অদৃষ্টপূর্ব ছবি। অন্যদিকে, তিনি আর এখন মূল দেনার কথাটা তোলেনই না: সে-দেনার খুঁটিনাটিগুলো এখন বেঁকেচুরে জট পাকিয়ে গেছে, ব্যাবসার খরচ যত জটিল হয়েছে তার কিস্তিগুলোও ততই বেড়েছে। তবু এরেন্দিরা ভুলেও কোনো দীর্ঘশ্বাস পড়তে দেয় না, সেটা হয়তো কাউকে এক ঝলক দেখাতে পারতো তার মনের মধ্যে কোন ভাবনারা পাক খাচ্ছে। হ্রদের ধারের শহরগুলোর বোধহীন অসাড়তায়, ধাতুর পাতের গুঁড়োয় ভরা খনির চান্দ্র সব জালামুখে, নীরবেই সে শোরার খনিতে বিছানার অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করে; আর সারাক্ষণ তখন ঠাকুমা তার কাছে গেয়ে শোনান ভবিষ্যতের ছবি, যেন তিনি তাশ প'ড়ে-প'ড়ে তার ভবিষ্যৎ ব'লে দিচ্ছেন। একদিন বিকেলে, তারা যখন বুকে-চেপে-বসা একটা বারান্দা থেকে

বেরিয়ে এসেছে, তারা লক্ষ করলে সুপ্রাচীন লরেলের এক বাতাস আর তারা শুনতে পেলে হ্যাঁচকা ছেঁড়া-ছেঁড়া জ্যামেকার ভাষার কথাবার্তা আর অনুভব করলে বেঁচে-থাকার একটা আকৃতি, আর বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা গেরো বেঁধে গেলো। তারা সমুদ্রে পৌঁছেছে।

'এই-যে সমুদ্র,' অর্ধেক জীবন নির্বাসনে কাটাবার পর ক্যারিবিয়নের কাচের মতো আলোয় শ্বাস টেনে ঠাকুমা বললেন : 'তোর ভালো লাগছে না এখানে?'

'সি, আবুয়েলা।'

সেখানেই তারা তাঁবু গাড়লে। ঠাকুমা রাতটা কাটালেন অনর্গল কথা ব'লে, স্বপ্ন না-দেখেই, আর মাঝে-মাঝেই তিনি গুলিয়ে ফেললেন তাঁর পিছুটান আর ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার প্রাঞ্জল দৃষ্টি। সচরাচর যখন শুতে যান তার চেয়েও পরে শুতে গেলেন, আর জেগে উঠলেন সমুদ্রের শব্দে, মেজাজ শরীফ, চাপ উধাও। তা সত্ত্বেও, এরেন্দিরা যখন তাঁকে স্নান করাচ্ছে তিনি আবার ভবিষ্যৎবাণী করলেন, আর এটা হ'লো এমনই এক জ্বরাতুর অলোকদৃষ্টি যে মনে হ'লো এটা যেন তাঁর রাতপাহারার প্রলাপবিকার।

'সম্ভ্রান্ত এক মহিলা হ'য়ে উঠবি তুই,' ঠাকুমা বললেন নাৎনিকে। 'সেনিওরা, অশেষ গুণের আধার, তোর অধীনে তোর তাঁবে যারা থাকবে তারা সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা করবে তোকে, আর কর্তৃপক্ষের একেবারে ওপরমহলের লোক তোকে সম্মান করবে, খাতির করবে। জাহাজের কাপ্তেনরা তোকে জগতের সব বন্দর থেকে ছবি-ছাপা পোস্টকার্ড পাঠাবে।'

এরেন্দিরা তাঁর কথা শুনছিলোই না। বাইরে থেকে বসানো এক নলের মধ্য দিয়ে ওষধি লতাপাতায় সুগন্ধি উষ্ণ জল গলগল ক'রে ঢুকছে স্নানের গামলায়। এরেন্দিরা সে-জল একটা লাউয়ের খোলে তুলে নিয়ে—অভেদ্য, এমনকী যেন শ্বাসও নিচ্ছে না—একহাতে তা ঠাকুমার ওপর ঢালছে আর অন্যহাত দিয়ে তাঁর গায়ে সাবান মাখাচ্ছে।

'তোর বাড়ির নামডাক মুখে-মুখে উড়ে বেড়াবে, আন্তিইয়ের স্তোর মালার মতো দ্বীপ থেকে ওলন্দাজ দেশের সীমা অব্দি,' ঠাকুমা ব'লেই চলেছেন। 'আর তোর বাড়ি রাষ্ট্রপতি-ভবনের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠবে, কারণ সরকারের সব নীতি-টিতি ওখানেই আলোচনা হবে, আর ওখানেই নির্ধারিত হবে দেশের ভবিতব্য।'

আচমকা নলের মধ্যে জলের তোড় থেমে গেলো। কী হচ্ছে দেখতে এরেন্দিরা

তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো, আর দেখতে পেলো যে-ইণ্ডিয়ানের ওপর জল ঢালবার ভার ছিলো সে রসুইঘরের পাশে কাঠ কাটছে।

'সব জল বেরিয়ে গেছে,' ইণ্ডিয়ানটি বললে। 'আমাদের আরো-কিছু জল ঠাণ্ডা করতে হবে।'

এরেন্দিরা উনুনের কাছে গিয়ে দেখতে পেলে আরো-একটা মস্ত ডেকচিতে সুগন্ধি ওষধি মেশানো জল টগবগ টগবগ ফুটছে। সে তার হাত জড়িয়ে নিলে কাপড়ে আর দেখতে পেলে ইণ্ডিয়ানটির সাহায্য ছাড়াই সে ডেকচিটাকে তুলতে পারে।

সে ইণ্ডিয়ানটিকে বললে, 'তুমি যেতে পারো। আমি নিজেই জল ঢেলে দেবো।'

ইণ্ডিয়ানটি রসুইঘর থেকে বেরিয়ে-যাওয়া অব্দি সে অপেক্ষা করলে। তারপর সে ঐ টগবগে জল তুলে নিলে উনুন থেকে, প্রচণ্ড চেষ্টা ক'রে ডেকচিটা তুললো নলের মুখ অব্দি, আর যেই সে সেই মারণজল নলের মুখে ঢালতে যাবে যাতে সেটা তক্ষুনি স্নানের গামলায় চ'লে যায় এমন সময় ঠাকুমা তাঁবুর মধ্য থেকে হেঁকে উঠলেন :

'এরেন্দিরা!'

মনে হ'লো তিনি যেন সব দেখে ফেলেছেন। নাৎনি, হাঁক শুনে ভয় পেয়ে, শেষ মুহূর্তে অনুশোচনায় ভ'রে গেলো।

'আসছি, আবুয়েলা,' সে বললে। 'আমি জল ঠাণ্ডা করছি।'

সে-রাত্তিরে সে শুয়ে-শুয়ে অনেক রাত অব্দি ভাবলে—আর ওপাশে সেই সোনার গেঞ্জি গায়ে ঠাকুমা ঘুমের ঘোরে তাঁর গান গেয়েই চললেন। নিজের বিছানা থেকে এরেন্দিরা তীব্র চোখে তাকালে, ছায়ার মধ্যে তার চোখ দুটকে দেখালো যেন কোনো বিড়ালির চোখ। তারপর, যেন কেউ জলের তলায় ডুবে গিয়েছে এমনভাবে সে ফিরে গেলো নিজের বিছানায়, বুকের ওপর তার হাত দুটি, চোখ দুটি ডাগর খোলা, আর সে তার যত জোর আছে সব দিয়ে মনে-মনে চেঁচিয়ে ডাকলে :

'উলিসেস!'

আচমকা নারঙ্গবিতানের বাড়িতে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো উলিসেস। এরেন্দিরার গলা সে এতই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে যে ঘরের ছায়ায় তার চোখ এরেন্দিরাকে খুঁজে-খুঁজে বেড়ালো। এক ঝলক ভেবে নিয়ে, সে তার জুতো জামা-কাপড় একটা পুঁটুলিতে বেঁধে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সে যখন পাতিও পেরিয়ে গিয়েছে তখন তার বাবার গলা তাকে চমকে দিলে :

'কোথায় যাচ্ছিস তুই ?'

চাঁদের আলোয় উলিসেস তাঁকে দেখলো নীল।

'পৃথিবীতে,' সে উত্তর দিলে।

'এবার আর আমি তোকে বাধা দেবো না,' ওলন্দাজ বললেন। 'তবে একটা বিষয়ে আমি তোকে হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছি: তুই যেখানেই যাবি তোর বাবার অভিশাপও যাবে তোর পেছন-পেছন।'

'তা-ই হোক তবে,' বললে উলিসেস।

একটু অবাক, এমনকী ছেলের প্রতিজ্ঞা দেখে একটু গর্বিতও, ওলন্দাজ তার পেছন-পেছন এলেন নারঙ্গকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে, আস্তে-আস্তে তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে মৃদু হাসি। তাঁর স্ত্রী তাঁর পেছনেই ছিলেন, ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকরা যেমন দাঁড়ায় তেমনি অপরূপভাবে। যখন উলিসেস ফটক বন্ধ ক'রে দিলে, ওলন্দাজ কথা বললেন :

'ও ফিরে আসবে,' বললেন তিনি, 'জীবনের মার খেয়ে ও ফিরে আসবে—তুমি যা ভাবছো তার চেয়েও তাড়াতাড়ি।'

'তুমি একটা গাড়ল,' উলিসেসের মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'ও আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না।'

সেবারে উলিসেসকে কাউকেই জিগেশ করতে হয়নি যে এরেন্দিরা কোথায়। একটা চলতি ট্রাকে লুকিয়ে চেপে উঠে সে পেরিয়ে এলো মরুভূমি, খাওয়া-দাওয়ার জন্যে চুরি করলে সে, অনেকবারই চুরি করলে নিছক যুঁকি নেবার বিশুদ্ধ মজা আর উত্তেজনাটা পাবে ব'লে, আর চলতেই থাকলো যতক্ষণ-না সে সমুদ্রতীরে আরেকটা শহরে খুঁজে পেলে তাঁবুটা, সে-শহরের কাচের বাড়িগুলো একটা আলোয় সাজা শহরের রূপ নিয়েছিলো, যেখানে ডুকরে-ডুকরে ওঠে আরুবা দ্বীপের উদ্দেশে বেরিয়ে-পড়া নোঙর-তোলা জাহাজগুলোর নৈশ ভোঁ। খাটিয়ার তক্তার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা, এরেন্দিরা ঘুমিয়ে ছিলো, সেই একই ভঙ্গিতে, যেমন বেলা-ভূমিতে পাওয়া যায় জলে-ডোবা কোনো লোকের মৃতদেহ, যে-ভঙ্গিতে শুয়ে থেকে সে ডেকে পাঠিয়েছিলো উলিসেসকে ; অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে, তাকে না-জাগিয়ে, তার দিকে তাকিয়ে রইলো উলিসেস, কিন্তু সে তার দিকে এমন তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো যে এরেন্দিরা জেগে গেলো। তারপর তারা চুমু খেলে অন্ধকারে, আস্তে সোহাগ করলে পরস্পরকে, ক্লান্তভাবে পোশাক খুললো এক-এক ক'রে, আর নীরব মমতায় আর গোপন সুখে ময় হ'লো রতি ও আরতিতে, যেটা ছিলো প্রণয়ের চেয়েও বেশি-কিছু।

তাঁবুর অন্য কোণায় ঠাকুমা একটা প্রকাণ্ড পাশ ফিরলেন আর প্রলাপ বকতে শুরু করলেন।

'গ্রীক জাহাজ এসে যখন পৌঁছেছিলো, এটা তখনকার কথা,' বললেন ঠাকুমা। 'খালাশিরা সব বদ্ধ পাগল—অথচ তারা মেয়েদের সুখে ভরিয়ে দিতো, কিন্তু পয়সার বদলে তাদের দিতো জলের জীব, স্পঞ্জ, জ্যান্ত-সব স্পঞ্জ, যেগুলো পরে বাড়িঘরে হেঁটে বেড়াতো হাসপাতালের রোগীদের মতো উহু-উহু কাৎরে আর যাতে তারা লোনা জলে পিপাসা মেটাতে পারে সেইজন্যে কাঁদিয়ে দিতো বাচ্চাদের।'

পাতালের একটা নড়াচড়ার ভঙ্গি ক'রে তিনি ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসলেন।

'সেই সময়েই সে এসে পৌঁছেছিলো, আমার দেবতা,' তিনি গাঁক-গাঁক করলেন, 'আরো বলিষ্ঠ, আরো দীর্ঘাকৃতি, আমাদিসের চাইতেও আরো-অনেকবেশি পুরুষ।'

উলিসেস—সে এর আগে এই প্রলাপের দিকে কখনোই মন দেয়নি—ঠাকুমাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু এরেন্দিরা তাকে শান্ত করলে।

তাকে বললে : 'ভয় পেয়ো না। যখনই উনি কাহনের এই জায়গায় এসে পড়েন তখনই উনি ধড়মড় ক'রে উঠে বসেন বিছানায়—কিন্তু উনি জাগেন না।'

উলিসেস তার কাঁধে হেলান দিলে।

'সে-রাত্তিরে আমি খালাশিদের সঙ্গে গান গাইছিলাম আর প্রথমে ভেবেছিলাম এ বুঝি কোনো ভূমিকম্প,' ঠাকুমা তোড়ে ব'লে চললেন। 'ওরাও সবাই নিশ্চয়ই তা-ই ভেবেছিলো কারণ তারা, হেসে খুন, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ছুটে পালিয়ে সারা, আর শুধু সে-ই ছিলো সেই তারার গানের চাঁদোয়ার তলায়। যেন কালকের ঘটনা, এমনিভাবে সব মনে পড়ে আমার, তখন সকলেই যে-গান গাইতো সেই গানই গাইছিলাম আমি। এমনকী উঠোনের তোতাগুলো অব্দি সেই গান গাইতো।'

মাদুরের মতো চ্যাপটা, যেমন লোকে শুধু স্বপ্নেই গায়, তিনি গেয়ে উঠলেন তাঁর তিক্ততার গান :

দাও হে, প্রভু, দাও, ফিরিয়ে দাও ফের
আমার নিষ্পাপ যা ছিলো, সব—
যাতে আবার আমি তার সোহাগস্পর্শেই
প্রথম থেকে করি পুনরুদ্ভব।

শুধু তখনই উলিসেস ঠাকুমার পিছুটানে আগ্রহ আর কৌতূহল বোধ করলে।

'ঐ তো ওখানে ছিলো সে,' ঠাকুমা ব'লেই চলছিলেন, 'কাঁধে একটা ম্যাকাও, লম্বা ল্যাজের টিয়া, আর মানুষখেকো-মারা গাদাবন্দুক, ঠিক যেভাবে গুয়াতারবাল এসে পৌঁছেছিলো গিয়ানায়, আর যখন সে এসে আমার সামনে দাঁড়ালে আমি তার মারণনিশ্বাস গায়ে পেলাম, সে বললে : "হাজার বার আমি সারা জগৎ চক্কর দিয়েছি, সব দেশের মেয়েই চেখে দেখেছি আমি, কাজেই বিষয়টা ভালো জানি ব'লেই আমি তোমায় বলতে পারি, তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে গরবিনী, সবচেয়ে রূপাময়ী, পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসী মেয়ে।"

আবার শুয়ে পড়লেন ঠাকুমা, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। উলিসেস আর এরেন্দিরা অ নে ক ক্ষ ণ চুপ ক'রে রইলো, প্রকাণ্ড ঘুমন্ত বৃদ্ধার বড়ো-বড়ো শ্বাসপ্রশ্বাসের ছায়ার মধ্যে দোল খেতে-খেতে। হঠাৎ এরেন্দিরা, তার গলায় একটুও কাঁপন নেই, বললে :

'ওঁকে খুন করতে তোমার সাহস হবে?'

আচমকা প্রশ্নটা শুনে উলিসেস ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না কী উত্তর দেবে।

'কে জানে,' সে বললে। 'তোমার সাহস হয়?'

'আমি পারিনি,' এরেন্দিরা বললে, 'উনি আমার ঠাকুমা।'

তখন উলিসেস আবার সেই প্রকাণ্ড ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকালে, যেন মনে-মনে খতিয়ে নিচ্ছে জীবনের কী তেজ আছে তাঁর এখনও, তারপর মনস্থির ক'রে বললে :

'তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি।'

...

পাঁচশো গ্রাম ইঁদুরমারা বিষ কিনে আনলে উলিসেস ; জামকলের মোরব্বা আর ফেনানো ক্ষীরের সঙ্গে তা খুব ক'রে ঘেঁটে মিশিয়ে সেই ক্ষীর সে একটা পিঠের মধ্যে ঢেলে দিলে—তা থেকে সে আগেই ভেতরের পুরটা চেঁছে সরিয়ে দিয়েছিলো। তারপর সে ওপরে রাখলে আরো-এক পল্লা ঘন ক্ষীর, চামচে বুলিয়ে-বুলিয়ে সেটা এমন মসৃণ ক'রে ফেললে যে এই পৈশাচিক কুৎকলাপের কোনো চিহ্নই আর রইলো না, আর ফাঁদটা সে সম্পূর্ণ করলে তার ওপর বাহাত্তরটা খুদে-খুদে গোলাপি মোমবাতি বসিয়ে।

ঠাকুমা তাঁর সিংহাসনে ব'সে দোর্দণ্ডটা ভয়দেখানোভাবে শূন্যে তুলে নাড়-ছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন তারা তাঁর জন্মদিনের কেকটা নিয়ে তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকছে।

'ওরে বেহায়া শয়তান!' তেড়ে উঠলেন ঠাকুমা। 'তোর কী সাহস যে তুই এখানে পা দিস!'

উলিসেস তার দেবদূত মুখের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

'আমি ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি,' সে বললে, 'আজকের এই দিনে, আপনার এই জন্মদিনে।'

এই ডাহা মিথ্যাটায় নিরস্ত্র হ'য়ে—কেননা কথাটা লক্ষ্যভেদ করেছিলো—ঠাকুমা টেবিলটা এমনভাবে সাজাতে বললেন যেন এটা কোনো বিয়ের ভোজ। উলিসেসকে তিনি তাঁর ডান পাশে বসালেন, আর এরেন্দিরা তাদের পাতে খাবার পরিবেষণ করলে, আর এক বিধ্বংসী ফুঁয়ে একসঙ্গে সব মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে, কেকটা তিনি দুই সমান অংশে কেটে ভাগ করলেন, আর একটা টুকরো দিলেন উলিসেসকে।

'যে-পুরুষ জানে কেমন ক'রে ক্ষমা পেতে হয় সে তো অর্ধেক স্বর্গ জিতেই ফেলেছে,' ঠাকুমার বাণী। 'তোমাকেই আমি প্রথম টুকরোটা দিলাম—সেটাই আসলে পরম সুখের ডাক।'

'আমার মিষ্টি ভালো লাগে না,' উলিসেস বললে, 'আপনিই খান।'

ঠাকুমা এরেন্দিরাকেও কেকের একটা টুকরো দিতে চাইলেন। সে সেটা নিয়ে রসুইঘরে চ'লে গেলো, আর সেটা আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

বাকি সবটা একাই খেলেন ঠাকুমা। একেকটা আস্ত টুকরো মুখে পুরছেন, চিবোনো-টিবোনোর কোনো বালাই নেই, কপ ক'রে গিলে ফেলছেন, আহ্লাদে মুখ দিয়ে অস্ফুট উম্‌ম্‌ম্ আওয়াজ বেরুচ্ছে, আর তাঁর উপভোগের লিম্বো থেকে কেবলই তাকাচ্ছেন উলিসেসের দিকে। যখন তাঁর নিজের রেকাবিটা চেটেপুটে সাবাড় করা হ'য়ে গেলো তখন উলিসেস যে-চাকটা খেতে চায়নি সেটাও তিনি খেয়ে ফেললেন। শেষ চাকটা চিবুতে-চিবুতে টেবিলঢাকা থেকে গুঁড়োগুলো তুলে নিলেন, তারপর সেগুলোও মুখে পুরে দিলেন।

ইঁদুরদের একটা আস্ত প্রজন্মই খতম হ'য়ে যেতো, এতটাই সেঁকোবিষ খেয়েছেন ঠাকুমা। অথচ তবু তিনি পিয়ানো বাজিয়ে মাঝরাত অব্দি গান গাইলেন, আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেলেন বিছানায়, আর এমনকী স্বাভাবিকভাবেই ঘুমিয়ে পড়লেন। যেটা শুধু নতুন হ'লো সেটা তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস—তাতে পাওয়া গেলো পাথরের ওপর কিছু-একটা আঁচড়ানোর আওয়াজ।

এরেন্দিরা আর উলিসেস অন্য বিছানাটা থেকে তাঁর ওপর নজর রাখছিলো,

অপেক্ষা ক'রে ছিলো কখন ওঠে মৃত্যুর ঘড়ঘড়। কিন্তু ঘুমের ঘোরে রোজকার মতো তিনি যখন প্রলাপ বকতে শুরু করলেন, গলাটা শোনালো আগের মতোই সজীব, সতেজ।

'আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম, ঈশ্বর, আমি একেবারেই পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম!' গাঁক-গাঁক করলেন ঠাকুমা। 'সে যাতে ভেতরে আসতে না-পারে সেজন্যে দু-দুটো হুড়কো লাগিয়ে দিয়েছিলাম আমার শোবার ঘরের দরজায়, দরজার গায়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম টেবিল, সাজচৌকি, ঘরের সবগুলো চেয়ার, আর সে কিনা তার হাতের আংটি দিয়ে শুধু একটা টোকা দিলে; আর সুরক্ষার সব আয়োজন মুহূর্তে ভেঙেচুরে ছত্রখান! টেবিলের ওপর থেকে চেয়ারগুলো যেন নিজে-নিজেই উল্টে পড়লো, টেবিল আর সাজচৌকি পরস্পরের কাছ থেকে আপনা থেকেই স'রে গেলো, হুড়কোগুলো নিজে থেকেই উঠে গেলো খাঁজ থেকে।'

এরেন্দিরা আর উলিসেস তাজ্জব হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো; যতই প্রলাপ অতি গম্ভীর আর নাটকীয় হ'য়ে উঠলো আর কণ্ঠস্বর হ'য়ে উঠলো আরো-অন্তরঙ্গ, ততই তাদের চোখগুলো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো।

'আমার মনে হ'লো আমি বুঝি ম'রেই যাচ্ছি, ভয়ে একেবারে ঘেমে-নেয়ে অস্থির, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনুনয় করছি দরজাটা যেন না-খুলেই খুলে যায়, সে যেন না-ঢুকেই ভেতরে ঢোকে, সে যেন কখনও চ'লে না-যায় আবার কখনও ফিরেও না-আসে, আমায় যাতে তাকে খুন করতে না-হয়।'

ফিরে-ফিরে তিনি আউড়েই চললেন তাঁর নাটক, কয়েক ঘণ্টা ধ'রে অবিশ্রাম, এমনকী সব অন্তরঙ্গ গোপন খুঁটিনাটিগুলো শুদ্ধু, যেন আবারও ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি ঘ'টে যাচ্ছে তাঁর স্বপ্নে। ভোরের একটু আগে বিছানায় তিনি পাক খেয়ে গড়িয়ে গেলেন ভূকম্পনতরঙ্গের মতো স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল আর গলাটা ভেঙে গেলো বোবা কান্নার আবির্ভাবে।

'তাকে আমি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা হেসেই উড়িয়ে দিলে,' চীৎকার ক'রে উঠলেন ঠাকুমা। 'আবারও তাকে সাবধান করলাম আমি আর আবারও সে হেসে উঠলো, যতক্ষণ-না সে চোখ খুললো আতঙ্কে, এই ব'লে: "উঃফ রানী! উঃফ রানী!" আর তার কথাগুলো তার মুখ দিয়ে আর বেরুচ্ছিলো না, বরং বেরুচ্ছিলো তার গলায় ছুরিটা যেখানে পোঁচ দিয়ে কেটেছে সেখান দিয়ে।'

ঠাকুমার ভয়াবহ আহৃত স্মৃতিচারণ শুনে উলিসেস আঁৎকে উঠে এরেন্দিরার হাত চেপে ধরলে।

'খুনে বুড়ি!' আর্ত চেঁচিয়ে উঠলো সে।

এরেন্দিরা তাকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছিলো না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ভোরের আলো ফুটতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। ঘড়ি ঘণ্টা বাজালো পাঁচটা।

'যাও!' এরেন্দিরা বললে, 'এখুনি উনি জেগে উঠবেন।'

'একটা হাতির চেয়েও কড়া জান ওঁর,' আর্ত ও বিস্মিত উলিসেস বললে, 'এ হ'তেই পারে না!'

এরেন্দিরা ছুরির ধারের মতো চোখে তাকালে তার দিকে, তার বাক্‌রোধ ক'রে দিলে।

বললে: 'পুরো গণ্ডগোলটা হ'লো এই যে তোমার কাউকে খুন করারও মুরোদ নেই!'

এই তিরস্কারের রূঢ় স্থূলতায় উলিসেস এতটাই ঘা খেলে যে সে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। গোপন তার ঘৃণা নিয়ে এরেন্দিরা নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলো তার ঘুমন্ত ঠাকুমার দিকে, হতাশা থেকেই প্রচণ্ড আক্রোশ জেগে উঠেছে তার মধ্যে, আর সূর্য উঠলো আর পাখি জাগলো আর হাওয়া ছুটলো। তারপরেই ঠাকুমা তাঁর চোখ খুলে শান্ত হেসে তার দিকে তাকালেন।

'ভগবান তোর সঙ্গে থাকুন, বাছা।'

একমাত্র লক্ষণীয় বদল হ'লো দৈনিক কার্যক্রমের তুলকালাম বিশৃঙ্খলা। দিনটা ছিলো বুধবার, কিন্তু ঠাকুমা চাইলেন গায়ে চাপাবেন রবিবাসরীয় পোশাক, ঠিক করলেন বেলা এগারোটার আগে এরেন্দিরা কোনো মক্কেলকেই তোয়াজ বা আপ্যায়ন করবে না, আর তাকে বললেন তাঁর নখ তামড়ির রঙে রাঙিয়ে দিতে আর মস্ত জমকালো খোঁপা ক'রে তাঁর চুল বেঁধে দিতে।

'এর আগে কখনোই আমার ছবি তোলবার জন্যে এত সাধ হয়নি,' বিস্মিত স্বরে ব'লে উঠলেন ঠাকুমা।

এরেন্দিরা তার ঠাকুমার চুল আঁচড়াতে শুরু করলে, কিন্তু যেই সে চুলের মধ্যে চিরুনি চালিয়েছে চিরুনির দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে গোছা-গোছা চুল উঠে এলো। আঁৎকে উঠে সে ঠাকুমাকে তা দেখালে। ঠাকুমা সেটা খুঁটিয়ে দেখলেন, আঙুল দিয়ে টান দিলেন আরেকটা গোছা, আর চুলের আরেকটা ঝোপ তাঁর হাতে উঠে এলো। সেটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তিনি আবার চুল ধ'রে টান দিলেন, আরো-একটা লম্বা গোছা উঠে এলো। তারপর তিনি দু-হাত দিয়ে তাঁর চুল টানতে শুরু ক'রে দিলেন; হেসেই খুন ঠাকুমা; মুঠো-মুঠো চুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন হাওয়ায় কেমন

এক অবোধ উল্লাসে, যতক্ষণ-না তাঁর মাথাটা দেখালো ছোবড়া ছাড়ানো নারকোলের মালার মতো।

দু-হপ্তা কেটে যাবার আগে উলিসেসের আর-কোনো পাত্তাই পেলে না এরেন্দিরা, তারপরেই হঠাৎ সে শুনতে পেলে তাঁবুর বাইরে প্যাঁচা ডেকে উঠলো। ঠাকুমা তখন পিয়ানো বাজাতে শুরু করেছেন আর তাঁর স্মৃতির ভেতর এতটাই তলিয়ে গেছেন যে বাস্তবের কোনো বোধই তাঁর ছিলো না। তাঁর মাথায় রংচঙে পালকের একটা পরচুল।

এরেন্দিরা পাঁচার ডাকে সাড়া দিলে আর তখনই সে খেয়াল করলে পিয়ানো থেকে বেরিয়ে-আসা সলতেটা—সেটা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সে ছুটে চ'লে গেলো সেখানে যেখানে উলিসেস লুকিয়ে আছে ঝোপের মধ্যে, গিয়েই সে লুকিয়ে পড়লো তার পাশে, আর বুকে কেমন-একটা আঁটো ভাব অনুভব ক'রে তারা দুজনে লক্ষ করলে ছোট্ট নীল শিখাটি কেমন ক'রে সলতে বেয়ে-বেয়ে বুকে হেঁটে যাচ্ছে, পেরিয়ে যাচ্ছে কালো অন্ধকার জমি, ঢুকে পড়ছে তাঁবুর মধ্যে।

'কানে হাত চাপা দাও,' বললে উলিসেস।

দুজনেই কান ঢাকলে, যদিও কোনো দরকারই ছিলো না, কারণ সেখানে কোনোই বাবুম-বুবুম-বুম হ'লো না। শুধু তাঁবুর ভেতরটা আলো হ'য়ে উঠলো, ঝকমকে এক দীপ্তি, বিচ্ছুরণ, স্তব্ধতায় ফেটে পড়লো, আর উধাও হ'য়ে গেলো রেণু-রেণু ভেজা জিনিশের ঘূর্ণিহাওয়ায়। ঠাকুমা এখন মারা গেছেন এই কথা ভেবে অবশেষে যখন এরেন্দিরা ভেতরে ঢোকবার সাহস পেলে সে গিয়ে দেখলো তাঁকে, পরচুলটা পোড়া, তাঁর রাতকাপড় ছিঁড়ে ফালি-ফালি, চিলতে, কিন্তু তিনি নিজে আগের চাইতেও আরো জ্যান্ত, একটা কম্বল চাপা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছেন।

উলিসেস পিছলে বেরিয়ে গেলো ইণ্ডিয়ানদের চীৎকার শোরগোলের আড়াল দিয়ে। ইণ্ডিয়ানরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না কী করা উচিত, আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিলো ঠাকুমার উলটোপালটা হুকুমে। যখন তারা শেষটায় শিখাগুলোকে জব্দ ক'রে নিতে পারলে, আর তাড়িয়ে দিলে ধোঁয়া, তারা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে সেখানে যেন প'ড়ে আছে একটা ভাঙাচোরা জাহাজ।

'এ-সবই অমঙ্গলটার কাজ', ঠাকুমা বললেন। 'পিয়ানো কখনো এমনভাবে ফেটে পড়ে না।'

নতুন তাণ্ডবটার কারণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ঠাকুমা একের পর এক খ্যাপাটে

অনুমান ক'রে গেলেন, কিন্তু এরেন্দিরার ব্যাপারটা এড়িয়ে-যাওয়া কিংবা তার অবিকার ভঙ্গি শেষটায় তাঁকে কেমন ধাঁধায় ফেলে দিলে। তাঁর নাৎনির ব্যবহারে কোনো চিড় কোনো ফাটল তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন না, উলিসেসের অস্তিত্বটাও তিনি বিবেচনা ক'রে দেখলেন না। ভোর অব্দি তিনি জেগে রইলেন, স্মৃতোগুলো জোড়া দেবার চেষ্টা ক'রে-ক'রে আর লোকশানের বহরটা আন্দাজ করতে-করতে খুব কমই ঘুমুলেন তিনি, তাও সে-ঘুম হ'লো ছেঁড়া-ছেঁড়া। পরদিন সকালে এরেন্দিরা তার ঠাকুমার সোনার চাক্তিবসানো গেঞ্জিটা খুলে নিলে, দেখতে পেলে তাঁর ঘাড়ের কাছে ফোসকা-ফোসকা, স্তনের ওপর বেরিয়ে আছে কাঁচা মাংস। 'ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরবার ভালো কারণ ছিলো,' এরেন্দিরা যখন তাঁর পোড়ায় ডিমের শাদা মাখাচ্ছে, তিনি বললেন। 'আর তাছাড়া ভারি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি।' গভীর মনোনিবেশ ক'রে স্বপ্নের ছবিটাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন ঠাকুমা, আর অবশেষে ছবিটা তাঁর স্মৃতিতে স্বপ্নের মতোই স্পষ্ট আর প্রাঞ্জল হ'য়ে এলো।

'শাদা দোলখাটিয়ায় একটা ময়ূর,' তিনি বললেন।

এরেন্দিরা শুনে অবাক হ'য়ে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখে প'রে নিলে প্রতিদিনের অভিব্যক্তি।

'এটা একটা শুলক্ষণ,' মিথ্যে বললে সে। 'স্বপ্নের ময়ূররা হ'লো দীর্ঘস্থায়ী সব প্রাণী।'

'ভগবান যেন তোর কথাই শোনেন,' ঠাকুমা বললেন, 'কারণ আবার আমরা ফিরে এসেছি প্রথম খোপটায়, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। আবার সব নতুন ক'রে শুরু করতে হবে আমাদের।'

এরেন্দিরা তার মুখের ভাব পালটালে না। সেঁক দেবার পুঁটুলিগুলো একটা রেকাবিতে নিয়ে সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো; তার ঠাকুমা ব'সেই রইলেন, ধড়টা ডিমের শাদায় ভেজানো, আর মাথার খুলিতে সর্ষেবাটা মাখা। রেকাবিতে আরো ডিমের শাদা রাখছিলো এরেন্দিরা। তালগাছের ছায়ায়, যেখানে রসুইঘর, সেখানে ব'সে-ব'সে। এমন সময় হঠাৎ উনুনের আড়ালে সে দেখতে পেলে উলিসেসের চোখ, যেমন সে দেখেছিলো প্রথমবার তার বিছানার পেছনে। এরেন্দিরা আঁৎকে ওঠেনি, শুধু ক্লান্ত অবসন্ন গলায় তাকে বললে :

'শুধু যেটা করতে পেরেছো সে হ'লো আমার দেনার বহরটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছো।'

উদ্বেগে উলিসেসের চোখ মেঘে ঢেকে গেলো। নিশ্চল, চুপচাপ, সে তাকিয়ে রইলো এরেন্দিরার দিকে, দেখলো কেমন ক'রে সে একের পর এক ডিম ফাটিয়েই চলেছে পরম ঘৃণায়, যেন উলিসেসের কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে। মুহূর্ত পরে চোখ দুটি নড়ালে, তাকিয়ে দেখলে রসুইঘরের জিনিশগুলো, ঝোলানো বাসনকোশন, খুঁতলিতে বাঁধা মশলা, মাংস কাটার ছুরি। উলিসেস উঠে দাঁড়ালে, এখনও সে কিছু বলছে না, আস্তে ঢুকলো সে তালপাতার ছাউনির তলায়, তারপর ছুরিটা হাতে তুলে নিলে।

এরেন্দিরা তার দিকে আর তাকায়নি, কিন্তু উলিসেস যখন ছাউনি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে তাকে খুব নিচু গলায় বললে:

'সাবধান থেকো, কারণ এর মধ্যেই উনি একবার মৃত্যুর হুঁশিয়ারি পেয়েছেন। শাদা দোলখাটিয়ায় একটা ময়ূরের স্বপ্ন দেখেছেন উনি।'

ঠাকুমা দেখলেন ছুরি হাতে উলিসেস ঘরে এসে ঢুকলো, আর একটা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তাঁর সেই দোর্দণ্ডের সাহায্য ছাড়াই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর দু-হাত তুললেন শূন্যে।

'ছেলে!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তোর কি মাথা খাপাপ হ'য়ে গেছে?'

উলিসেস তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিলে তাঁর নগ্ন বুকে। ঠাকুমা কাৎরে উঠলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর, তাঁর সবল ভালুক হাতে তার গলা টিপে মারবার চেষ্টা করলেন।

'কুত্তির বাচ্চা!' গরগর ক'রে উঠলেন ঠাকুমা। 'বড্ড দেরি ক'রে আবিষ্কার করলাম তোর মুখটা আসলে বেইমান দেবদূতের মতো!'

আর-কিছু বলতে পারলেন না ঠাকুমা, কারণ উলিসেস তখন কোনোরকমে ছুরিটা টেনে বার ক'রে নিয়েছে, এবার সে ছুরিটা ঢোকালে পাশ থেকে। ঠাকুমার মুখ থেকে গোপন এক গোঙানি বেরিয়ে এলো, হানাদারকে তিনি আরো জোরে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন। উলিসেস ছুরিটা হানলে তৃতীয়বার, দয়াবিহীন, আর রক্তের একটা দমকা, উঁচু চাপে ছাড়া পেয়ে, ফোয়ারার মতো ছিটকে পড়লো তার মুখে: তেলতেলে রক্তের ফোয়ারা, জলজলে, সবুজ, যেন তা পুদিনার মধু।

এরেন্দিরা দেখা দিলে দরজায়, তার হাতে রেকাবি, আর যুদ্ধটা সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে কোনো অপরাধীর ভাবলেশহীন মুখে।

বিশাল, যেন কোনো একশিলা, ব্যথায় আক্রোশে গর্জন করছেন, ঠাকুমা পাকড়ে ধরলেন উলিসেসের শরীর। তাঁর বাহু, তাঁর পা, এমনকী তাঁর নিকেশ মাথা রক্তে

সবুজ হ'য়ে গিয়েছে। তাঁর প্রকাণ্ড হাপরের মতো শ্বাসপ্রশ্বাস, মৃত্যুর প্রথম ঘড়-ঘড়ানি কেমন যেন ছন্দহারানো, সারা জায়গাটা ভর্তি ক'রে দিচ্ছে। হাতিয়ার সমেত হাতটা কোনোরকমে আরো-একবার ছাড়িয়ে নিয়ে এলো উলিসেস, খুলে দিলে তাঁর পেটের মধ্যে একটা চির, আর রক্তের এক দমকা বিস্ফোরণ তাকে ভিজিয়ে সবুজ ক'রে দিলে, মাথা থেকে পায়ের পাতা অব্দি। ঠাকুমা চেষ্টা করলেন খোলা হাওয়ায় পৌঁছুতে, হাওয়া চাই এখন, হাওয়া, বাঁচতে হ'লে হাওয়া চাই, আর মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলেন। উলিসেস নিষ্প্রাণ বাহুপাশ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলো, আর এক মুহূর্তও না-থেমে প্রকাণ্ড প'ড়ে-থাকা শরীরটায় শেষবার বসিয়ে দিলে ছুরি।

এরেন্দিরা তখন রেকাবিটা নামিয়ে রাখলে টেবিলে, ঝুঁকে পড়লো তার ঠাকুমার ওপর, তাঁকে স্পর্শ না-ক'রেই সব খুঁটিয়ে দেখলে। যখন সে নিঃসংশয় হ'লো যে তিনি মারা গেছেন, তার মুখ হঠাৎ অর্জন ক'রে বসলো কোনো বয়স্কের পাকা ভাব যেটা তার কুড়ি বছরের দুর্ভাগ্যও অ্যাদ্দিন তাকে দিতে পারেনি। ক্ষিপ্র, নিখুঁত, সুঠাম হাতে সে সোনার গেঞ্জিটা পাকড়ে ধরলো, তারপর তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

উলিসেস বসেছিলো মৃতদেহের পাশে, যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত, আর যতই সে তার মুখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে ততই তার মুখ চটচটে সবুজ জ্যান্ত পদার্থে ভ'রে গেলো—মনে হচ্ছে যেন তার আঙুল থেকেই তা গলগল ক'রে বেরিয়ে আসছে। যখন সে দেখতে পেলে এরেন্দিরা সোনার গেঞ্জি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শুধু তখনই সে নিজের দশা সম্বন্ধে সম্বিৎ ফিরে পেলে।

সে চেঁচিয়ে ডাকলে এরেন্দিরাকে, কিন্তু কোনো সাড়া পেলে না। সে নিজেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলো তাঁবুর মুখে, আর দেখতে গেলে এরেন্দিরা শহর থেকে দূরে সমুদ্রতীর ধ'রে ছুটতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তখন সে একটা শেষ চেষ্টা করলে তার পেছনে ধাওয়া ক'রে যাবার, বারে-বারে চেঁচিয়ে ডাকলে তাকে ব্যথাতুর ধরা গলায় যেটা এখন আর কোনো প্রেমিকের গলা নয়, বরং যেন কোনো ছেলের গলা, কারু সাহায্য ছাড়াই কোনো স্ত্রীলোককে খুন ক'রে সে যেন একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে। ঠাকুমার ইণ্ডিয়ানরা যখন তার নাগাল পেলে সে তখন বেলাভূমিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে, আর হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে আতঙ্কে আর নিঃসঙ্গতায়।

এরেন্দিরা তাকে শুনতেই পায়নি। সে ছুটে যাচ্ছে হাওয়ায়, কোনো হরিণের চেয়েও ক্ষিপ্র, আর জগতের কোনো কণ্ঠস্বরই তাকে থামাতে পারতো না। একবারও

মাথা না-ঘুরিয়েই, সে পেরিয়ে গেলো শোরার খনি, ধাতুর পাতের জালামুখ, ঝুপড়ি-আটচালাগুলোর জবড়জং, যতক্ষণ-না শেষ হ'লো সমুদ্রের প্রকৃতিবিজ্ঞান আর শুরু হ'লো মরুভূমি। তবু কিন্তু সে ছুটেই চললো সোনার গেঞ্জিটা নিয়ে উষর হাওয়ার পরপারে, আর কখনও-শেষ-না-হওয়া সূর্যাস্তগুলো পেরিয়ে। তার কথা আর-কোনোদিনই শোনা যায়নি অথবা পাওয়া যায়নি তার দুর্ভাগ্যের সামান্যতম চিহ্নও।

১৯৭২

মৃত্যুই ধ্রুব প্রণয়ের পরপারে

মৃত্যুর মুখোমুখি হবার যখন ছ-মাস এগারো দিন বাকি তখনই সেনাদোর ওনেসিমো সানচেস খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের নারীকে। তার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো কুহকের গ্রাম রোসাল দেল ভিরেইতে, অলীক যে-গ্রামটি রাত্তিরে হ'য়ে ওঠে চোরাচালানিদের জাহাজ ভেড়াবার ঘাট, আর অন্যদিকে, প্রকাশ্য দিবালোকে যাকে দেখায় নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কোনো খাঁড়ির মতো, পথ ভুল ক'রে যেটা মরুভূমিতে ঢুকে পড়েছে, এমন-এক সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যেটা উষর, দিকহারা, সবকিছু থেকেই এত দূরে যে ভুলেও কেউ সন্দেহই করতে পারতো না যে কারু ভাগ্যকে বদ্‌লে-দেবার ক্ষমতা রাখে এমন-কেউ সেখানে থাকে। এমনকী তার নামটাও যেন একটা মস্করা, কারণ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র যে-গোলাপটি আছে সেটা পরেছিলেন সেনাদোর ওনেসিমো সানচেসই স্বয়ং, সেই একই বিকেলে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো লরা ফারিনার।

প্রতি চার বছর পর-পর তাঁকে যে নির্বাচনী প্রচার-অভিযানে বেরুতে হয়, তাতে এই গ্রামে থামাটা অপরিহার্যই। কার্নিভালের টানাগাড়িগুলো এসে পৌঁছেছে সকালবেলায়। তারপর এসেছে ভাড়া-করা ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে ট্রাক-গুলো, সরকারি কোনো অনুষ্ঠানে চিরকাল তাদের শহরগুলোয় নিয়ে-যাওয়া হয় ভিড় বাড়াতে। বেলা এগারোটার একটু আগে, অনুচরদের গান-বাজনা হাউই-পটকা আর জিপগাড়িগুলোর সঙ্গে, মন্ত্রীমহোদয়ের ধনুকমণি সোডার রঙের মোটর-গাড়ি এসে পৌঁছেছে। সেনাদোর ওনেসিমো সানচেস তাঁর বাতানুকূলিত গাড়ির ভেতরে এতক্ষণ ছিলেন অবিচল আর আবহাওয়াবিহীন, অথচ যেই তিনি গাড়ির দরজা খুললেন আগুনের একটা হলকা তাঁকে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে গেলো, আর তাঁর খাঁটি রেশমি জামাটা হালকারঙের কোনো সুরুয়ায় ভিজে সপসপে হ'য়ে উঠলো, নিজেকে তাঁর হঠাৎ বয়েসের তুলনায় বড্ড বুড়ো লাগলো, আর ভারি একা লাগলো তাঁর, আগের চাইতেও একা। বাস্তব জীবনে তিনি সদ্য পা দিয়েছেন বিয়াল্লিশে, গয়টিনগেন থেকে ধাতুবিৎ এনজিনিয়ার হিশেবে সাম্মানিক সহ স্নাতক হয়েছেন ; গোগ্রাসে তিনি বই পড়েন, যদিও খুব-একটা লাভ হয় না তাতে, পড়েন তিনি খুব বাজে তর্জমা-করা ফ্রুপদী সব লাতিন বই। এক ঝলমলে আলেমান মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে, যিনি তাঁকে দিয়েছেন পাঁচটি সন্তান, আর তারা

সবাই সুখেই আছে বাড়িতে ; তিনি নিজেই ছিলেন সবচাইতে সুখী যতক্ষণ-না তিনমাস আগে তারা তাঁকে বললে যে আগামী বড়োদিনের মধ্যেই চিরকালের মতো ইহলোকের লীলা ঘুচবে তাঁর ।

জনসভার জন্যে যাবতীয় প্রস্তুতি যখন সারা হচ্ছে, তাঁর বিশ্রামের জন্যে তারা যে-বাড়িটা বরাদ্দ করেছিলো সেনাদোর সেখানে ঘণ্টাখানেক একা থাকবার সুযোগটা বাগিয়ে নিয়েছেন । শুয়ে-পড়ার আগে খাবার জলের গেলাশটায় তিনি গোলাপটা ডুবিয়ে দিলেন, গোটা মরুভূমিতেই এটাকে তিনি বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন, যে-পথ্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসছেন তাতেই সেরেছেন দুপুরের খাওয়া যাতে দিনের বাকি সময়ে তাঁর জন্যে অনবরত ও পুনরাবৃত্ত পাঁঠার মাংসের ভাজা-ভুজি অপেক্ষা ক'রে আছে সেটা এড়িয়ে যেতে পারেন । কয়েকটা ব্যথাকমানো বড়িও গিলে ফেললেন তিনি, ব্যবস্থাপত্রে যে-সময়ে খেতে বলা হয়েছে তার আগেই, যাতে ব্যথাটা চাগিয়ে ওঠবার আগেই সেটাকে তিনি ঠেকাতে পারেন । তারপর তিনি দোলখাটিয়ার কাছে টেনে নিয়ে এলেন বিজলি পাখাটা, গোলাপের ছায়ায় মিনিট পনেরো শুয়ে রইলেন বিবস্ত্র, ঢুলতে-ঢুলতে প্রচণ্ড চেষ্টা করলেন মনকে অন্য খাতে বওয়াতে যাতে মৃত্যুর কথা তাঁকে ভাবতে না-হয় । ডাক্তাররা ছাড়া, আর-কেউই জানে না যে রায় বেরিয়ে গিয়েছে তাঁর, নির্দিষ্ট একটা সময়ই শুধু তিনি বাঁচবেন, কারণ তিনি ঠিক ক'রে নিয়েছেন তাঁর এই গুপ্তকথা তিনি একাই সহ্য করবেন,কোনো বদল ঘটাবেন না জীবনযাপনে, সেটা কিন্তু অহমিকাবশত নয়, বরং মৃত্যুকে তাঁর মনে হচ্ছিলো একটা ডাহা কেলেঙ্কারি ।

বেলা তিনটেয় যখন আবার তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হলেন, তাঁর মনে হ'লো সবকিছুই এখন তাঁর আয়ত্তে : বিশ্রাম হয়েছে, পরিচ্ছন্ন, রুক্ষ তাফতায় তৈরি স্ল্যাকস আর ফুল-কাটা জামা গায়ে, আর ব্যথাকমানো বড়ির দৌলতে তাঁর মেজাজটাও শরীফ । তৎসত্ত্বেও, তিনি যা ভেবেছিলেন তিল-তিল এই মরণ তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর ; কারণ যখন তিনি মঞ্চে উঠছেন, তখন যারা তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার সৌভাগ্যের জন্যে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছিলো তাদের জন্যে এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা তিনি অনুভব করলেন । খালি-পা ইণ্ডিয়ানরা প্রায় সইতেই পারে না ঊষর বন্ধ্যা ছোট্ট স্কোয়ারের তপ্ত শোরার কয়লা ; অন্যসময়ে তাদের দেখে তাঁর দয়াই হ'তো, কিন্তু এখন বরং উলটোটাই হ'লো । হাত নেড়ে তিনি হাততালির দমকাটা থামিয়ে দিলেন, প্রায় যেন তেড়েফুঁড়েই, রুষ্ট, আর কোনো মুদ্রা ব্যবহার না-ক'রেই তিনি কথা বলতে শুরু ক'রে দিলেন, দৃষ্টি নিবদ্ধ সমুদ্রের ওপর—যে-সমুদ্র গরমে এখন হাঁসফাঁস করছে । তাঁর মাপা, গভীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন অতল

জলেরই ছোঁয়াচ, কিন্তু যে-ভাষণটি তিনি মুখস্থ করেছেন আর গমপেষাইয়ের মতো জাঁতা থেকে এতবার বার ক'রে দিয়েছেন যে তাঁর কাছে মনেই হ'লো না সে-ভাষণে কোনো সত্য কথা বলবার ধরন আছে, বরং তা যেন মার্কাস অরেলিয়াসের 'ধ্যানপুঁথি'র চতুর্থ খণ্ডের নিয়তিবাদী উচ্চারণের উলটোটাই ব'লে মনে হ'লো ।

'আমরা এখানে আছি প্রকৃতিকে হার মানাবো ব'লে,' তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই তিনি শুরু করলেন । 'আমাদের নিজেদের দেশে আমরা আর কুড়িয়ে-পাওয়া অনাথ হ'য়ে থাকবো না, পিপাসা আর বিকট জলবায়ুর মহালে ঈশ্বর-পরিত্যক্ত হ'য়ে থাকবো না আমরা, আর থাকবো না নিজ বাসভূমে পরবাসী । সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আমরা একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে উঠবো—মহান এবং সুখী জনগণ হ'য়ে উঠবো আমরা ।'

তাঁর এই সার্কাসের পেছনে একটা ছক একটা নকশা আছে । যখন তিনি কথা বলছেন, তাঁর অনুচরেরা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলে ঝাঁকে-ঝাঁকে কাগজের পাখি আর এই নকল পাখিরা হাওয়ায় প্রাণ পেয়ে গেলো, তক্তা বসিয়ে তৈরি-করা মঞ্চের ওপর ঘুরে বেড়ালো এলোমেলো, তারপর উড়ে চ'লে গেলো সমুদ্রে । ঠিক তখন, অন্য অনুচরেরা ঠেলাগাড়িগুলোর মধ্য থেকে নিয়ে এলো শোলার পাতা লাগানো কতগুলো খুঁটি, নাটমঞ্চের গাছ, আর ভিড়ের পেছনে শোরার জমিতে সেগুলো তারা পুঁতে দিলে। কাচের জানলা বসানো লাল ইঁটের বাড়ির ভাণ—কার্ডবোর্ডে তৈরি তার সদর—বসিয়ে দিয়ে শেষ করলে ভোজবাজি, আর এই বাড়িগুলো দিয়ে তারা ঢেকে দিলে সত্যিকার, ভাঙাচোরা, ঝুপড়ি আর আটচালাগুলো ।

সেনাদোর তাঁর ভাষণ বিলম্বিত করলেন লাতিন থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে যাতে প্রহসনটায় আরো সময় কাটে । তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন বৃষ্টি তৈরির কারখানা, খাবারটেবিলের প্রাণীদের জন্যে সহজে-বহনীয় বংশবর্ধক, সুখবিলাসের স্নেহপদার্থ যা শোরার জমিতে ফলাবে শাকসব্জি, আর জানলায়-জানলায় বাক্সভর্তি সব বেগনি ফুল । যখন তিনি দেখলেন তাঁর কাল্পনিক জগৎ বসানো হ'য়ে গেছে, তিনি আঙুল তুলে সেটা দেখালেন । 'সেনিওরা ও সেনিওরগণ, এইরকমই হবে সবকিছু আমাদের জন্যে ।' চেঁচিয়ে বললেন : 'দেখুন ! এইরকমই হবে সব—আমাদের জন্যে ।'

শ্রোতারা ফিরে তাকালে । রং-করা কাগজে বানানো বড়ো একটা সমুদ্রগামী জাহাজ বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে ভেসে চলেছে, সেই নকল নগরীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ির চাইতেও সেটা উঁচু । সেনাদোর শুধু নিজেই খেয়াল করলেন যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বারে-বারে নিয়ে-যাওয়া এই লজ্ঝড় শহরের ওপর চাপানো

কার্ডবোর্ডের শহরটাকে উৎকট ও ভয়ংকর জলবায়ু এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছে, এটা এখন রোসাল দেল ভিরয়েইয়ের মতোই গরিব, বেচারি, ধূলিমলিন ও হতশ্রী।

বারো বছরের মধ্যে এই প্রথমবার, নেলসন ফারিনা সেনাদোরকে অভ্যর্থনা করতে যায়নি। রুক্ষ, পালিশ না-করা, কাঠে তৈরি বাড়ির ছায়ায়—যে-বাড়িটা সে তৈরি করেছে সেই একই ভেষজবিদের হাতে, যে-হাত দিয়ে টেনে নিয়ে সে তার প্রথমা স্ত্রীকে কুচি-কুচি ক'রে কেটেছিলো—তার সিয়েস্তার ভগ্নাবশেষের মধ্যে তার দোলখাটিয়া থেকেই সে বক্তৃতাটা শুনছিলো। ডেভিলস আইল্যাণ্ড [যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর] থেকে পালিয়ে এসে সরল সব ম্যাকাওতে ভরা এক জাহাজে ক'রে সে আবির্ভূত হয়েছিলো রোসাল দেল্ ভিরয়েইয়ে, সঙ্গে ছিলো পরমা রূপসী ও খিস্তি-খেউড়ে মহাওস্তাদ এক কালো মেয়ে, যাকে সে আবিষ্কার করেছিলো পারামারিবোতে, আর যার মারফৎ সে জন্ম দিয়েছে এক মেয়ের। কিছুদিন বাদেই সেই সুন্দরী কৃষ্ণা স্বাভাবিক কারণেই মারা যায়—অন্য স্ত্রীর কপালে যা ছিলো সেই দুর্ভোগ তাকে আর সইতে হয়নি—সেই যার কুচি-কুচি টুকরো দিয়ে সে তার ফুল-কপি ফলানোর জমিতে সার দিয়েছিলো, বরং তার ওলন্দাজ নাম সমেত স্থানীয় গোরস্থানে এই দ্বিতীয়া স্ত্রীকে কবর দেয়া হয়েছিলো সর্বাঙ্গসুষ্ঠাম। মেয়েটি উত্তরাধিকার পেয়েছে শ্যামল রং আর তার দেহসৌষ্ঠব, সঙ্গে পেয়েছে বাবার অবাক-অবাক হলুদ চোখ, আর নেলসন ফারিনার এ-কথা ভাববার সংগত কারণই আছে যে সে জগতের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে বড়ো ক'রে তুলছে।

যেদিন থেকে সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেসের সঙ্গে তাঁর প্রথম নির্বাচনী সফরে তার আলাপ হয়েছে সেদিন থেকেই নেলসন ফারিনা তাঁকে অনুনয় ক'রে চলেছে তার জন্যে একটা নকল শনাক্তপত্রের ব্যবস্থা ক'রে দিতে, যা তাকে আইনের খপ্পর থেকে বাঁচাবে। সেনাদোর খুবই বন্ধুভাবে কিন্তু দৃঢ় স্বরে প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিয়েছেন। নেলসন ফারিনা কিন্তু কখনোই হাল ছেড়ে দেয়নি, গত কয়েক বছর ধ'রে যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই, ততবারই, ভিন্ন কোনো ছুতোয় বা ওজরে ফিরে অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু এবারে সে প'ড়ে রইলো দোলখাটিয়ায়, ক্যারিবিয়নের বোম্বেটেদের সেই জলন্ত আড্ডায় জ্যান্ত ঝলসে মরবার জন্যে দণ্ডিত। যখন সে শেষ হাততালি শুনতে পেলে, সে তার মাথা তুললো, বেড়ার কাঠগুলোর ওপর দিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে পেলে রগড়টার, প্রহসনটার, পশ্চাদ্দেশ: বাড়িঘরের ঠেকনো, গাছগুলোর কাঠামো, গোপন মায়াবীরা—সমুদ্রগামী জাহাজটাকে যারা ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ঢং দেখে সে কোনো বিদ্বেষ ছাড়াই শব্দ ক'রে থুতু ফেললে।

'ম্যের্দ,' সে বললে, 'সে ল্য ব্লাকামেন দ্য লা পোলিতিক।' (যাঃ কলা, এ যে স্রেফ রাজনীতির ব্লাকামান।')

ভাষণের পর, দস্তর অনুযায়ী, সেনাদোর শহরের রাস্তাগুলো দিয়ে হেঁটে গেলেন গানবাজনা আর পটকা ও হাউইয়ের মধ্য দিয়ে, শহরের লোকেরা তাঁকে চারপাশ থেকে আক্রমণ ক'রে কেবলই তাঁকে তাদের দুঃখের কাহন কাঁদুনি গেয়ে শোনালে। সেনাদোর সদাশয়ভাবেই তাদের সব কথা শুনলেন, আর এ-রকম সময়ে চিরকালই তাদের কোনো দুরূহ দাক্ষিণ্য দেখাবার ভড়ং ছাড়াই তিনি পেয়ে যান সবাইকে সান্ত্বনা জানাবার বাঁধা গৎ। এক স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিলো তার বাড়ির ছাতে তার ছোটো ছজন ছেলেমেয়ে সমেত, আর সব কোলাহল আর বাজিপটকার মধ্যেও সে চেঁচিয়ে নিজের কথা শোনাতে পারলে।

'আমি বেশি-কিছু চাচ্ছি না, সেনাদোর,' সে বললে। 'শুধু একটা গাধা চাই—ফাঁসি-যাওয়ার কুয়ো থেকে জল আনবার জন্যে।'

ছ-ছজন রোগা টিংটিঙে ছেলেমেয়েকে তাকিয়ে দেখলেন সেনাদোর। 'তোমার মরদের কী হ'লো?' সেনাদোর জানতে চাইলেন।

'সে তার কপাল ফেরাতে গেছে আরুবা দ্বীপে,' স্ত্রীলোকটি খোশমেজাজেই জবাব দিলে। 'আর গিয়ে যা পেয়েছে সে হ'লো এক ভিনদেশী মাগি—সেই তাদেরই একজন যারা তাদের দাঁতেও হিরে বসায়।'

উত্তরটা একটা হাসির হর্রা তুললো।

'ঠিক আছে,' সেনাদোর ঠিক ক'রে ফেললেন। 'তুমি তোমার গাধা পেয়ে যাবে।'

একটু পরেই তাঁর এক অনুচর সেই স্ত্রীলোকের বাড়িতে একটা ভালোজাতের মালবওয়া গাধা নিয়ে এসে হাজির হ'লো আর মোছা-যায়-না এমন রঙে তার পাছায় লিখে দেওয়া হ'লো চুনাওয়ের একটা জিগির, যাতে কেউ কখনও না-ভোলে যে এটা স্বয়ং সেনাদোরেরই একটি উপহার।

রাস্তার ছোট্ট প্রসার ধ'রে তিনি এইরকম আরো অন্য ছোটোখাটো বদান্যতা দেখালেন। একজন রুগী সবাইকে ধ'রে তার বিছানাটা নিয়ে এসেছিলো দরজার কাছে যাতে সেনাদোর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সে তাঁকে চর্মচক্ষে দেখতে পারে—সেনাদোর এমনকী তার মুখে এক দাগ ওষুধও ঢেলে দিলেন। শেষ মোড়টায়, বেড়ার কাঠগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখলেন নেলসন ফারিনা শুয়ে আছে তার দোলখাটিয়ায়, কী-রকম মনখারাপ আর ছাইধূসর দেখাচ্ছে তাকে, তবু সেনাদোর তাকে সম্ভাষণ জানালেন—ভাব-ভালোবাসার কোনো আদিখ্যেতা না-ক'রেই অবশ্য।

'এই-যে, কেমন ?'

নেলসন ফারিনা তার দোলখাটিয়ায় পাশ ফিরে তার দৃষ্টির করুণ অম্বরে তাঁকে ভিজিয়ে দিলে।

'মোয়া, ভু সাভে (আমি, আপনি তো জানেনই),' সে বললে।

সম্ভাষণ শুনে তার মেয়ে বেরিয়ে এলো উঠোনে। সে পরেছিলো শস্তা রং-চটা গুয়াহিরো ইণ্ডিয়ান আংরাখা, রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা তার মাথার চুল, রোদ্দুরের হাত থেকে মুখটিকে বাঁচাবার জন্যে তাতে ছিলো রং মাখা; তবু এমনকী, সেই বেমেরামতি দশাতেও এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিলো যে সারা জগতে আর-কেউ অত সুন্দরী নয়। সেনাদোরের প্রায় দম আটকে গেলো। 'গোল্লায় যাবো আমি!' নিশ্বাসের ফাঁকে তিনি ফিশফিশ করলেন। 'প্রভু যে কত তাজ্জব ব্যাপারই ঘটান!'

সে-রাত্তিরে নেলসন ফারিনা তার মেয়েকে সাজালে তার সেরা পোশাকে, তারপর তাকে সেনাদোরের কাছে পাঠিয়ে দিলে। রাইফেলে সশস্ত্র দুই পাহারোলা ধার-করা বাড়িটার গরমে ঢুলছিলো, তারা তাকে সেনাদোরের ঘরের পাশে একমাত্র চৌকিটায় বসতে হুকুম করলে।

পাশের ঘরে সেনাদোর তখন রোসাল দেল ভিরেইয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে ব'সে সভা করছেন: তাঁর বক্তৃতা থেকে যে-সব সত্য তিনি ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন সেগুলোই গেয়ে শোনাবেন ব'লে তাদের তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মরুভূমির অন্যান্য শহরে যে-ধরনের লোকের সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ হয়েছে, এদেরও সবাইকেই তাদের মতো এতই একরকম দেখতে যে সেনাদোরের নিজেরই এই চিরন্তন নৈশ আলোচনা সভা অসহ্য ও বিরক্তিকর ঠেকছিলো। তাঁর জামা ঘামে ভিজে সপসপ করছে, এক বিজলি পাখার গরম হাওয়ার হলকায় গায়েই তিনি জামাটা শুকোবার চেষ্টা করছেন—পাখাটা ঘরের ভারি গরমে ঘোড়ার নাদির ওপর নীল মাছির মতো গুঞ্জন করছে।

'বাহুল্য বলা যে আমরা কাগজের পাখি খেতে পারি না,' সেনাদোর বলছিলেন। 'আপনারা আর আমি, আমরা সবাই জানি যেদিন এই ছাগলের নাদির গাদায় গাছ গজাবে আর ফুল ফুটবে, যেদিন জলের গর্তগুলোয় কিলবিলে পোকার বদলে ইলিশমাছ পাওয়া যাবে, সেদিন আপনার আমার আর-কিছুই করার থাকবে না এখানে। কী? আমি স্পষ্ট বোঝাতে পারছি তো কথাটা?'

কেউ কোনো উত্তর দিলে না। কথা বলতে-বলতে সেনাদোর ক্যালেণ্ডার থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিলেন, তা থেকে নিজের হাতেই তিনি বানিয়ে

নিচ্ছিলেন এক কাগজে প্রজাপতি। প্রজাপতিটাকে বিশেষ কোনোদিকে তাগ না-ক'রেই তিনি শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন, আর পাখার হাওয়ায় প্রজাপতিটা ফরফর ক'রে এলোমেলো উড়ে বেড়ালো ঘরে, তারপর আধখোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। মৃত্যুর সঙ্গে যোগসাজশ হ'লে সবকিছুর ওপর যেমন দখল জন্মায়, তেমনি ভঙ্গিতেই সেনাদোর কথা ব'লে চললেন।

'সেইজন্যেই,' বললেন সেনাদোর, 'আপনাদের কাছে আমাকে নিশ্চয়ই ফিরে বলতে হবে না যে আপনারা সবকিছুই খুব ভালো জানেন: আমার পুনরনির্বাচন আমার কাছে যতটা, আপনাদের কাছে সেটা তার চেয়েও বেশি লাভের ব্যাবসা—কারণ আমি এইসব বদ্ধ ডোবা আর ইণ্ডিয়ান ঘামে একেবারেই অসহ্য বোধ করছি—অথচ আপনারা, অন্যদিকে, তার ওপর নির্ভর ক'রেই টাকা কামাচ্ছেন, আখের গুছোচ্ছেন।'

লরা ফারিনা কাগজের প্রজাপতিটাকে উড়ে আসতে দেখলো। শুধু সে-ই তাকে দেখতে পেলো, কেননা এ-ঘরের শান্ত্রীরা সিঁড়ির ওপর তাদের রাইফেল-গুলো জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কয়েকবার ফরফর ক'রে ঘুরে, রঙিন ছাপানো প্রজাপতিটা পুরো ডানা খুলে, দেয়ালের গায়ে পুরোপুরি লেপটে বসলো—আর সেখানেই আটকে রইলো। লরা ফারিনা তার নোখ দিয়ে সেটাকে উপড়ে তোলবার চেষ্টা করলে। পাহারোলাদের একজন, পাশের ঘরে হাততালির শব্দ শুনে সে জেগে গিয়েছে, তার ব্যর্থ চেষ্টাটা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে।

'ও আর উঠবে না,' ঘুম-ঘুম গলায় সে বললে, 'ও তো দেয়ালে এঁকে দেয়া।'

লরা ফারিনা আবার তার চৌকিতে বসতে-না-বসতেই লোকজন সব সভা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলে। সেনাদোর দরজায় দাঁড়িয়ে, হাতটা খিলের ওপর; পাশের ঘরটা যখন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেলো, শুধু তখনই তিনি খেয়াল করলেন লরা ফারিনাকে।

'তুমি এখানে কী করছো?'

'সে ত্য লা পার ত্য মঁ পের (এটা আমার বাবার কাণ্ড),' সে বললে।

সেনাদোর বুঝতে পারলেন। পাহারোলাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি, খুঁটিয়ে দেখলেন লরা ফারিনাকে—আপাদমস্তক; তাঁর সব ব্যথাবেদনার চাইতেও এই মেয়েটির অসাধারণ সৌন্দর্য যেন আরো নাছোড় দাবি জানাচ্ছে, আর তখনই তিনি ঠিক ক'রে ফেললেন তিনি নন বরং যে মৃত্যুই তাঁর হ'য়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

'এসো, ভেতরে,' তিনি বললেন তাকে।

ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে লরা ফারিনা একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেলো। হাজার-হাজার ব্যাঙ্কনোট পৎপৎ উড়ছে হাওয়ায়, তারা যেন পাখা নাড়ছে প্রজাপতিটার মতোই, কিন্তু সেনাদোর বোতাম টিপে পাখা বন্ধ ক'রে দিতেই নোটগুলি হাওয়া খুইয়ে ফরফর ক'রে ঘরের নানান জিনিশের ওপর এসে পড়লো।

'দেখলে তো,' তিনি বললেন, মুচকি হেসে। 'এমনকী গুও উড়তে পারে।'

লরা ফারিনা স্কুলের ছেলেদের একটা চৌকির ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়লো। টান-টান ও মসৃণচিক্কণ তার গায়ের চামড়া; খনির তেলের মতো রং টশটশ করছে, যেন তেমনি সৌর ঘনত্বে ভরপুর; তার মাথার চুল যেন কোনো তরুণ ঘোটকীর কেশরের মতো; আর ডাগর চোখগুলো আলোর চাইতেও উজ্জ্বল। সেনাদোর তার দৃষ্টির সূতো অনুসরণ ক'রে অবশেষে গোলাপটিকে দেখতে পেলেন, শোরা সেটায় এখন দাগ ধরিয়ে দিয়েছে।

'এটা একটা গোলাপ,' সেনাদোর বললেন।

'হ্যাঁ, জানি,' কেমন-একটু হতভম্বভাবেই বললে লরা ফারিনা। 'রিওআচায় থাকতেই জেনেছিলাম এগুলো কী ফুল।'

সেনাদোর একটি ফোজি খাটিয়ায় ব'সে পড়লেন, জামার বোতাম খুলতে-খুলতে তিনি গোলাপ নিয়েই কথা ব'লে চললেন। তাঁর বুকের যেদিকটায় হৃৎপিণ্ড আছে ব'লে তিনি কল্পনা করেছিলেন, সেখানে—নৌবহরের জাহাজের কাপ্তেনদের বুকে যেমন উল্কি থাকে, তেমনি—একটা উল্কি দাগা: একটা হরতন এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে একটা তীর চ'লে গিয়েছে। তাঁর ভেজা জামাটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে তিনি লরা ফারিনাকে বললেন তাঁর বুটজোড়া খুলতে সাহায্য করতে।

খাটিয়ার মুখোমুখি নতজানু হ'য়ে বসলো লরা ফারিনা। সেনাদোর, চিন্তিত-ভাবে, তাকে খুঁটিয়ে দেখেই চলেছেন, আর সে যখন জুতোর ফিতে খুলছে, তিনি মনে-মনে অনুমান করবার চেষ্টা করলেন এই দেখা-হওয়াটায় দুজনের মধ্যে কে-সে ভিমি খেয়ে পড়বে দুর্ভাগ্যে।

'একেবারেই কচি মেয়ে তুমি,' তিনি বললেন।

'সেটা কিন্তু বিশ্বাস করবেন না,' সে বললে, 'এই এপ্রিলে আমি উনিশে পা দেবো।'

সেনাদোর হঠাৎ খুব কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন।

'কত তারিখে?'

'এগারো,' সে বললে।

সেনাদোর একটু ভালো বোধ করলেন। 'আমাদের দুজনেরই মেষরাশি,' তিনি বললেন। তারপর একটু হেসে যোগ করলেন:

'সেটা কিন্তু নিঃসঙ্গতার চিহ্ন।'

লরা ফারিনা এ-সব কথায় কোনো মনোযোগ দিচ্ছিলো না, কারণ সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না এই বুটজোড়া নিয়ে সে কী করবে। সেনাদোর আবার, তাঁর দিক থেকে, বুঝতে পারছিলেন না লরা ফারিনাকে নিয়ে তিনি কী করবেন, কারণ তিনি কোনোদিনই আকস্মিক প্রেমে-টেমে অভ্যস্ত নন, তাছাড়া তিনি জানেন নাগালের মধ্যে যে-মেয়েটি আছে তার জন্ম হয়েছিলো কলঙ্কে। ভাববেন ব'লে একটু সময় ক'রে নেবার জন্যে, তিনি লরা ফারিনাকে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলেন, জড়িয়ে ধরলেন তার কোমর, তারপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লেন তক্তপোশে। আর তখনই তিনি টের পেলেন তার পোশাকের তলায় মেয়েটি একেবারে নগ্ন, কারণ তার শরীর থেকে বনের কোনো জন্তুর মতো অন্ধকার ঝাঁজ বেরিয়ে আসছে—তবে তার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠছে ভয়ে, আর গায়ের চামড়া এক হিমজমাট ঘামে ঘাবড়ে গিয়েছে।

'কেউ আমাদের ভালোবাসে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেনাদোর।

লরা ফারিনা কী যেন বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু শুধু শ্বাস নেবার মতোই হাওয়া পেলে সে সেখানে। তাকে একটু সাহায্য করবার জন্যে তাকে তিনি তাঁর পাশে শোয়ালেন, নিভিয়ে দিলেন আলো, আর ঘরটা গোলাপের ছায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো। খুব ধীরে-ধীরে তাকে সোহাগ করলেন সেনাদোর, খুঁজলেন তাকে তাঁর আদর ভরা হাত দিয়ে, প্রায় যেন তাকে না-ছুঁয়েই, কিন্তু যেখানে তিনি তাকে খুঁজে পাবেন ব'লে ভেবেছিলেন, সেখানে লোহায়-তৈরি কী-একটা তাঁর সন্ধানী হাতকে আটকে দিলে।

'ওখানে তোমার ওটা কী?'

'কুলুপ,' সে বললে, 'একটা তালা।'

'এ আবার কোন জাহান্নাম!' ক্ষিপ্ত সেনাদোর ব'লে উঠলেন, আর যা তিনি খুব ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছেন, সেই বিষয়টাই জিগেশ করলেন। 'চাবি কই'?

লরা ফারিনা একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লে।

'চাবিটা বাবার কাছে,' সে উত্তর দিলে। 'বাবা বললেন আপনার কোনো লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসতে, আর সেই সঙ্গে একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি পাঠাতে যে আপনি তাঁর ঝামেলাগুলো মিটিয়ে দেবেন।'

টান-টান হ'য়ে গেলেন সেনাদোর। 'ফরাশি বেজন্মা, ব্যাঙের বাচ্চা!' ঘৃণায়

আর রাগে বিড়বিড় করলেন তিনি। তারপর তিনি টান-টান ভাবটা কাটাবার জন্যে চোখ বুজলেন আর অন্ধকারে দেখা পেলেন নিজেরই। মনে রেখো, আর তিনি মনে ক'রে নিলেন, সে তুমিই হও বা অন্য-কেউই হোক, খুব বেশিদিন কাটবে না—তুমি ম'রে যাবে, আর বেশিদিন কাটার আগে তোমার নামটার অব্দি কোনো চিহ্ন থাকবে না।

শিহরনটা কেটে যাবার জন্যে তিনি সবুর করলেন।

'আচ্ছা,' তিনি তখন জিগেশ করলেন, 'আমায় তুমি একটা কথা বলো। আমার সম্বন্ধে তুমি কী শুনেছো?'

'আপনি কি সত্যি-সত্যি জানতে চান? ভগবানের নামে হলফ?'

'ভগবানের নামে হলফ—সত্যি কথা বলবে।'

'বেশ, বলছি,' লরা ফারিনা সাহস ক'রে এগুলো, 'ওরা বলে, আপনি অন্য সবার চেয়েও অধম, কারণ আপনি আলাদা ধরনের মানুষ।'

সেনাদোর চ'টে গেলেন না। অনেকক্ষণ, চোখ বুজে, তিনি চুপ ক'রে রইলেন।

যখন তিনি আবার চোখ খুললেন, মনে হ'লো তিনি যেন তাঁর সব চাইতে গোপন প্রবৃত্তিগুলো থেকে ফিরে এসেছেন।

'ওঃ, সে আর-কোন জাহান্নামের চাইতে বেশি হবে?' তক্ষুনি তিনি মনস্থির ক'রে নিলেন, 'তোমার ঐ কুত্তির বাচ্চা বাপটাকে বোলো আমি তার ঝামেলাগুলো মিটিয়ে দেবো।'

'আপনি যদি চান তো আমি নিজেই গিয়ে চাবিটা নিয়ে আসতে পারি,' লরা ফারিনা বললে।

সেনাদোর তাকে আটকালেন।

'চাবি গোল্লায় যাক,' তিনি বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে একটু ঘুমোও। যখন তুমি অত একা তখন কেউ-একজন সঙ্গে থাকলেই ভালো।'

তখন লরা ফারিনা তার মাথা রাখলে তাঁর কাঁধে, তার চোখ দুটো আটকে আছে গোলাপের ওপর। সেনাদোর তার কোমর জড়িয়ে রইলেন, মুখ গুঁজলেন তার বনের-জন্তুর বগলে, আর নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন আতঙ্কের কাছে। ছ-মাস এগারো দিন পরে, ঠিক ঐ ভঙ্গিতেই তিনি মারা যাবেন; লরা ফারিনাকে জড়িয়ে যে-কেচ্ছাটা রটবে তার জন্যে কাদায় লেপা আর পরিত্যক্ত; আর মারা যাবেন লরা ফারিনাকে ছাড়াই মরতে হচ্ছে ব'লে প্রচণ্ড আক্ষোভে কাঁদতে-কাঁদতে।

With Best Compliments From :

SKYLINE COURIER AND TRAVEL SERVICE

KAMALALAYA CENTRE

156A, LENIN SARANI

(Ground Floor) Room No. 81

CALCUTTA-700 013

A dependable City Courier Service. Specialist in Nepal Package tour

BIVAV

Price : Rs. 10·00 | 48th Issue | Reg. No.

Vol. 13. No. 2 | January – March 90 | R. N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL No. ISSN 0970 – 1885

সংসদ-এর অভিধান গ্রন্থমালা

☐ সংসদ ব্যাকরণ অভিধান

সুলভ সংস্করণ ২৫.০০ : শোভন সংস্করণ ৩০.০০

☐ সংসদ সমার্থশব্দকোষ

(পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬০.০০

☐ সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ৭৫.০০

☐ সংসদ বাঙ্গালা অভিধান ৬০.০০

☐ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

দু'খণ্ড। প্রতি খণ্ড ১১০.০০

☐ Samsad English-Bengali Dictionary

Revised Fifth Edition ৮০.০০

☐ Samsad Bengali-English Dictionary

Revised Second Edition ৭০.০০

☐ Samsad Student's Bengali-English Dictionary ৩০.০০

☐ Samsad Student's English-Bengali Dictionary ৩০.০০

☐ Samsad Common Words Dictionary

(English-Bengali) ২০.০০

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯